

## প্রথম অধ্যায়

### তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি : বিশ্ব ও বাংলাদেশ প্রেক্ষিত

Information and Communication Technology: World and Bangladesh Perspective



বলবলু-১ স্যাটেলাইটের উৎক্ষেপণ দৃশ্য

অতীতের শিল্পবিপ্লবের অনুরূপ এই যুগে আমরা একটি শিল্পবিপ্লবের স্তরের দিকে যাচ্ছি যে বিপ্লবটিকে আমরা তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির বিপ্লব বলে আখ্যায়িত করতে পারি। এই বিপ্লবটির বৈশিষ্ট্য হচ্ছে যে এটি পৃথিবীর প্রায় প্রতিটি মানুষের জীবনধারাকে স্পর্শ করেছে। পুরো পৃথিবীর সকল মানুষ প্রথমবার পারস্পরিক সহযোগিতা এবং সহমর্মিতার বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে একটি অভিন্ন মানবগোষ্ঠী হিসেবে নিজেদের উপস্থাপন করার সুযোগ পেয়েছে।

#### এ অধ্যায় পাঠ শেষে শিক্ষার্থীরা—

- বিশ্বগ্রামের ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারবে;
- বিশ্বগ্রামের ধারণা-সংশ্লিষ্ট প্রধান উপাদানগুলো ব্যাখ্যা করতে পারবে;
- বিশ্বগ্রাম প্রতিষ্ঠায় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির অবদান মূল্যায়ন করতে পারবে;
- ভার্চুয়াল রিয়েলিটির ধারণা বিশ্লেষণ করতে পারবে;
- প্রাত্যহিক জীবনে ভার্চুয়াল রিয়েলিটির প্রভাব মূল্যায়ন করতে পারবে;
- তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির সাম্প্রতিক প্রবণতা বিশ্লেষণ করতে পারবে;
- তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহারে নৈতিকতা বজায় রাখার গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারবে;
- সমাজ জীবনে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির প্রভাব মূল্যায়ন করতে পারবে;
- অর্থনৈতিক উন্নয়নে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ভূমিকা বিশ্লেষণ করতে পারবে;
- মূল্যবোধ বজায় রেখে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহারে উদ্বুদ্ধ হবে।

কর্ম-১, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি, একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণি

### ১.১ বিশ্বগ্রামের ধারণা (Concept of Global Village)

‘ছায়া সুনিবিড় শান্তির নীড়’ আমাদের স্বপ্নের গ্রামের ধারণা। এখানে সবাই সবাইকে চেনেন, প্রতিদিন সবার সাথে সবার দেখা হয়, রাত পোহালে একজন অন্যজনের খবরাখবর নেন, কুশলাদি বিনিময় করেন, সুখ ও দুঃখের ভাগীদার হন। গ্রামের মানুষের যে জীবনাচার, প্রত্যেকের প্রতি প্রত্যেকের যে মমত্ববোধ বা আন্তরিকতা রয়েছে শহরে জীবনে তা হয়তো সম্ভব নয়। সারা বিশ্বের মানুষ ভৌগোলিক দূরত্বে থেকেও যদি গ্রামীণ পরিবেশের মতো একে অপরের পাশাপাশি থাকত তাহলে অর্থনৈতিক, জাতিগত, ধর্মীয় বা রাজনৈতিক বিভেদ ভুলে গিয়ে সৌহার্দ আর ভ্রাতৃত্বের পরিবেশ গড়ে সর্বত্র নিবিড় ও সামষ্টিক উন্নয়ন সম্ভব হতো। বিশ্বগ্রাম বা গ্লোবাল ভিলেজের ধারণার সূত্রপাত মূলত এসব চিন্তাধারাকে কেন্দ্র করেই।

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির অভূতপূর্ব উন্নয়ন এবং তথ্যের নিবিড় আদান-প্রদানের মাধ্যমে গোটা বিশ্বের মানুষের মধ্যে পারস্পরিক পরিচিতি ও সম্পর্কের বন্ধন সুদৃঢ় হচ্ছে এবং প্রথমবারের মতো বিশ্বগ্রাম সৃজনের সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচিত হচ্ছে। আমরা নিজেরাই অনুভব করতে পারি যে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ক্রমোন্নয়নের কারণেই আমরা বিশ্ববাসী এখন কেউ কারো থেকে দূরে কিংবা বিচ্ছিন্ন নই।



চিত্র 1.1 : কানাডিয়ান দার্শনিক হার্বার্ট মার্শাল ম্যাকলুহান

বিশিষ্ট কানাডিয়ান দার্শনিক হার্বার্ট মার্শাল ম্যাকলুহান (Herbert Marshall McLuhan) ষাটের দশকে সর্বপ্রথম কীভাবে বৈদ্যুতিক প্রযুক্তি এবং তথ্যের দ্রুত বিচরণ, স্থান এবং সময়ের বিলুপ্তি ঘটিয়ে সমগ্র বিশ্বে একটি গ্রাম বা ভিলেজে রূপান্তরিত করা যেতে পারে সেই ধারণাটি সবার সামনে উপস্থাপন করেছিলেন। গ্লোবাল ভিলেজ হলো এমন একটি পরিবেশ ও সমাজ যেখানে তথ্য প্রযুক্তির মাধ্যমে যুক্ত হয়ে পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলের মানুষ পরস্পরের সাথে যোগাযোগ করাসহ বিভিন্ন ধরনের সাহায্য-সহযোগিতা প্রদান করতে পারে। তথ্য

প্রযুক্তির এই বিশ্বায়ন প্রক্রিয়ার কারণে তথ্য প্রবাহের অবাধ ও সহজলভ্য উৎস তৈরি হয়েছে। এতে করে সার্বিক জীবনযাত্রার মান ও কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি পেয়েছে। ফলে ব্যবসা-বাণিজ্য সম্প্রসারণ, দূরশিক্ষণ, চিকিৎসাসেবা বৃদ্ধিসহ বিশ্বব্যাপি ব্যাপক কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। তবে এটি বাস্তবায়নের জন্য মানুষের এ ব্যাপারে সচেতনতা, সক্ষমতা, আগ্রহ, জ্ঞান, দক্ষতা এবং উপযোগিতা থাকা প্রয়োজন। এর সাথে হার্ডওয়্যার, সফটওয়্যার, নেটওয়ার্কের সাথে সংযুক্ততা এবং বিশ্বাসযোগ্য ডেটা বা তথ্য সংরক্ষণ এবং প্রক্রিয়াকরণের ক্ষমতা থাকতে হবে।

অবশ্য এ প্রক্রিয়ায় তথ্য উন্মুক্ত ও সহজলভ্য করার কারণে ক্ষতিকারক এবং অসত্য তথ্য অনুপ্রবেশের আশঙ্কা সৃষ্টি হচ্ছে, যার কারণে সামাজিক এমনকি রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিসহ ব্যক্তিগত গোপনীয়তায় অনৈতিক হস্তক্ষেপ, সাইবার আক্রমণ এবং প্রযুক্তি বিভেদ-বৈষম্যেরও জন্ম দিচ্ছে। পৃথিবীর গুটিকতক তথ্য প্রযুক্তির বড় বড় কোম্পানি তথ্য নিয়ন্ত্রণ করে পৃথিবীর ভারসাম্যকে বিপদগ্রস্ত করে তোলার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে।

বিশ্বগ্রাম ধারণা সংশ্লিষ্ট প্রধান উপাদানগুলো (Principal components regarding concept of Global village) নিচে আলোচনা করা হলো:

### ১.১.১ যোগাযোগ (Communication)

যোগাযোগ বলতে আমরা সবসময়েই এক জায়গার সাথে অন্য জায়গার যোগাযোগ বুঝিয়ে এসেছি এবং বিশ্বগ্রামের ধারণার মাঝে এই যোগাযোগ একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে এসেছে। কারণ আধুনিক যোগাযোগ ব্যবস্থার কারণে একজন মানুষ বিমানে, দ্রুতগামী ট্রেনে অথবা আধুনিক সড়ক ব্যবস্থা ব্যবহার করে খুব অল্প সময়ের মাঝে এক শহর থেকে অন্য শহরে কিংবা এক দেশ থেকে অন্য দেশে চলে যাতে পারে। তবে বিশ্বগ্রামের প্রেক্ষিতে যোগাযোগ ব্যবস্থা বলতে এখন একই সঙ্গে তথ্যের আদান-প্রদান কিংবা ভাব বিনিময় করাকেও বোঝায়। কখন, লিখন কিংবা অন্য কোনো মাধ্যমে তথ্যের আদান-প্রদানই এই যোগাযোগ এবং এই যোগাযোগই এখন বিশ্বগ্রাম ধারণার প্রধান উপাদান।

নতুন নতুন প্রযুক্তিগত উদ্ভাবন যোগাযোগের ক্ষেত্রে বৈপ্লবিক পরিবর্তনের সূচনা করেছে। শত বছরের পুরনো তারযুক্ত টেলিফোন যন্ত্রের পরিবর্তে তারবিহীন মোবাইল ফোনের আবির্ভাব হয়েছে। তারবিহীন এ প্রযুক্তির কল্যাণে আমরা ইন্টারনেটের পরিসেবাগুলো যেমন ওয়েব ব্রাউজিং, ই-মেইল, ফ্যাক্স, ম্যাসেঞ্জার, ইমো, হোয়াটসঅ্যাপ, ভাইবার, গুগল মিট, জুম ইত্যাদির সাহায্যে মুহূর্তের মধ্যে সারা বিশ্বের যে কোনো প্রান্তের মানুষের সাথে যোগাযোগ করা সম্ভব হচ্ছে।

এই যোগাযোগ ব্যবস্থাকে টেলিযোগাযোগ (Telecommunication) এবং তথ্য যোগাযোগ (Information communication) এই দুই ভাগে ভাগ করা যেতে পারে। এক সময় তার-নির্ভর টেলিফোনই ছিল টেলিযোগাযোগের একমাত্র মাধ্যম। পরবর্তীকালে বেতার টেলিযোগাযোগ আবিষ্কৃত হওয়ার পর আধুনিক টেলিযোগাযোগ যন্ত্রের মধ্যে টেলিফোন, মোবাইল ফোন, রেডিও, টেলিভিশন, ওয়াকিটকি ইত্যাদির ব্যবহার সর্বত্র ব্যাপকভাবে পরিলক্ষিত হয়।

অন্য দিকে নিয়ম ও নিরাপত্তার বিষয়টি বজায় রেখে তথ্য স্থানান্তর বা শেয়ার করা হচ্ছে বর্তমান তথ্য প্রযুক্তির যুগে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। উদাহরণ হিসেবে ইন্টারনেট এবং ইন্টারনেট-নির্ভর সার্ভিস যেমন ই-মেইল, সামাজিক নেটওয়ার্কিং, ওয়েবসাইট, ভিডিও কনফারেন্সিং ইত্যাদির কথা বলা যায়। ই-মেইল (E-mail) হলো ইন্টারনেটের মাধ্যমে নির্ভরযোগ্যভাবে বার্তা আদান-প্রদান পদ্ধতি। আজকাল একজন মানুষের প্রকৃত ঠিকানা থেকে তার ই-মেইল ঠিকানা বেশি প্রয়োজনীয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। সামাজিক নেটওয়ার্কিং দিয়ে একে অন্যের সাথে যোগাযোগ, তথ্য, ছবি এবং ভিডিও বিনিময় কিংবা সংবাদ প্রচারের কাজ করা হয়। সামাজিক নেটওয়ার্কিং ব্যবহার করে পৃথিবীতে অনেক বড় সামাজিক কিংবা রাজনৈতিক আন্দোলন গড়ে তোলা হয়েছে। ভিডিও কনফারেন্সিং পদ্ধতিতে অংশগ্রহণকারীরা অডিও-ভিজুয়াল পদ্ধতিতে সভা করতে পারেন। ইন্টারনেটে এখন পৃথিবীর প্রায় সকল প্রতিষ্ঠান ওয়েবসাইটের মাধ্যমে নিজেদের পরিচিতি সকলের সামনে তুলে ধরে। ইন্টারনেটভিত্তিক এই পদ্ধতিগুলোর ব্যাপক জনপ্রিয়তার একটি বড় কারণ সময় এবং অর্থের সাশ্রয়।

তবে ইন্টারনেট কিংবা সামাজিক নেটওয়ার্কিং-এর উপর বেশি নির্ভরতা, বিশেষ করে তরুণ প্রজন্মের জন্য অনেক সময়েই আসক্তির পর্যায়ে চলে যাবার কারণে পুরো পৃথিবীতেই এর ব্যবহার এখন আলাদাভাবে পর্যালোচনা করে দেখা হচ্ছে।

### ১.১.২ কর্মসংস্থান (Employment)

বিশ্বের প্রায় প্রতিটি দেশেই বেকারত্বের সমস্যা রয়েছে। তথ্য প্রযুক্তি ও যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতির ফলে উন্নয়নশীল দেশগুলোর একটি বিরাট অংশ ইন্টারনেটের মাধ্যমে ঘরে বসেই দেশে এবং দেশের বাইরে চাকুরির বাজারে আবেদন করে নিজেদের বেকারত্ব দূর করতে পারছে। আমাদের দেশেও বিগত প্রায় দু দশক

ধরে বিভিন্ন দেশের চাকুরি ও নিয়োগ সংক্রান্ত খবরাখবর নিয়ে কয়েকটি জব-পোর্টাল চালু আছে। এগুলোর মধ্যে [www.bdjobs.com](http://www.bdjobs.com), [www.chakri.com](http://www.chakri.com), [www.everjobs.com](http://www.everjobs.com) ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। এসব ওয়েবসাইটে ব্যক্তিগত তথ্যের গোপনীয়তা বজায় রেখে অনলাইনে চাকুরির আবেদন করা যায়। এছাড়া ঘরে বসেই ইন্টারনেটের মাধ্যমে কাজ করে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের সুযোগ রয়েছে। এ ধরনের কর্মসংস্থানে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিকে কাজে লাগিয়ে এক দেশের নাগরিক ভিন্ন ভিন্ন দেশের নাগরিকের বা প্রতিষ্ঠানের পক্ষে দূর থেকে কাজ করে থাকেন। এই কার্যক্রমকেই আউটসোর্সিং (বহিঃউৎসরণ) বলে। আমাদের দেশে প্রত্যেকটি ইউনিয়নে তথ্য ও সেবা কেন্দ্র চালু হয়েছে, এর ফলে অনেকের কাজের সুযোগ হয়েছে, অনেকে উদ্যোক্তা হিসেবে অন্যদের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করেছেন। এখানে আলাদাভাবে ‘উবার’ কিংবা ‘পাঠাও’য়ের মতো সেবার কথা উল্লেখ করতে হয়, যেগুলো যান পরিবহনের ক্ষেত্রে অসংখ্য মানুষের কর্মসংস্থান করে দিয়েছে। আবার তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহার করে কোনো প্রতিষ্ঠানের কাজ খণ্ডকালীন বা চুক্তিভিত্তিক পদ্ধতি যে কেউ স্বাধীনভাবে নিজের দক্ষতা অনুযায়ী কাজ করতে পারেন। কাজের স্বাচ্ছন্দ্যের পাশাপাশি কাজের স্থান ও সময়ের কোনো বাঁধাধরা নিয়ম না থাকায় এ পেশার জনপ্রিয়তা রয়েছে। এই ধরনের চুক্তিভিত্তিক কাজকে ফ্রিল্যান্সিং (স্ব-উদ্যোগের কাজ) বলা হয়। বিশ্বব্যাপী কয়েকটি জনপ্রিয় মার্কেটপ্লেস বা জব শেয়ারিং ওয়েবসাইট যেমন— Upwork, Freelancer, Belancer, Fiverr ইত্যাদিতে ডেটা অ্যানালাইসিস, কপি রাইটিং, গ্রাফিক্স ডিজাইনিং, সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্ট, ওয়েব ডেভেলপমেন্ট, এফিলিয়েট মার্কেটিং, সার্চ ইঞ্জিন অপটিমাইজেশন (এসইও), গুগল অ্যাডসেন্স, ভার্সুয়াল অ্যাসিসটেন্ট, রিসার্চ এন্ড সার্ভে, আর্টিক্যাল-ব্লগ রাইটিং ইত্যাদি নানাধরনের বৈচিত্র্যময় কাজ করা যায়।

অবশ্য ফ্রিল্যান্সিং কাজের মাধ্যমে অর্থোপার্জন আপাতদৃষ্টিতে আকর্ষণীয় মনে হলেও ভিন্নধর্মী জীবন যাপন অর্থাৎ আত্মীয়-স্বজন বা পরিবার-বিচ্ছিন্নতা এ কাজের বড় ধরনের নেতিবাচক দিক। রাত জেগে কাজ করা, দক্ষতা অনুযায়ী কাজ না পাওয়া, কাজের জোগান দিতে বাধ্য-হওয়া-জনিত মানসিক চাপ, সরবরাহকৃত কাজের যথাযথভাবে মূল্যায়ন না হওয়া বা পারিশ্রমিক পরিশোধের ক্ষেত্রে নানাবিধ জটিলতা এবং সর্বোপরি পেশা হিসেবে সামাজিকভাবে স্বীকৃত না হওয়ায় অনেকেই এ ধরনের কাজে নিরুৎসাহিত বোধ করে থাকেন।

### ১.১.৩ শিক্ষা (Education)

বিশ্বগ্রামের ধারণায় শিক্ষা খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি উপাদান, কারণ সত্যিকার শিক্ষাই একজন মানুষকে সমাজ এবং পরিবেশ সচেতন, মুক্তচিন্তায় বিশ্বাসী, উদার বিশ্বনাগরিক হতে সাহায্য করে। দ্রুত পরিবর্তনশীল এই পৃথিবীতে প্রাচীন শিক্ষা ব্যবস্থার ধ্যান-ধারণার পরিবর্তে চলমান শতাব্দীর উপযোগী শিক্ষা ব্যবস্থা বা পদ্ধতিতে এসেছে নূতন মাত্রার গতিশীলতা এবং যান্ত্রিকায়ন। শিক্ষার্থীদের মেধা-মননের সাথে তাল মিলিয়ে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির যথোপযুক্ত ব্যবহার নিশ্চিত করে এগিয়ে যাচ্ছে শিখন পদ্ধতি।

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি শিক্ষা বিস্তারে একটি শক্তিশালী উপকরণ যা আনুষ্ঠানিক এবং অনানুষ্ঠানিক উভয় পদ্ধতিতেই অত্যন্ত কার্যকর। এতে করে নির্ধারিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আর শিক্ষকের পাশাপাশি বিশ্বমানের প্রায় যে কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আর শিক্ষকগণের সাহচর্যে তথ্য ও জ্ঞানের ভান্ডার ব্যবহার এখন খুবই সহজ। একসময় মূল্যবান পাঠ্যবই অনেক দেশে খুবই দুর্লভ একটি বিষয় ছিল, এখন ই-বুকের কারণে স্বল্পমূল্যে বা বিনামূল্যে সবাই পাঠ্যবই পেতে পারে। আমাদের দেশেও জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের প্রকাশিত সকল পাঠ্যপুস্তক তাদের ওয়েবসাইট থেকে ই-বুক আকারে ডাউনলোড করা যায়। বিশ্বগ্রাম ধারণায় শিক্ষা গ্রহণের জন্য শিক্ষার্থীদেরকে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় কিংবা একদেশ থেকে অন্যদেশে যেতে হবে না, তারা নিজের ঘরে বসেই শিক্ষা গ্রহণ করতে পারবে। ২০২০ সালে সারা পৃথিবীব্যাপি Covid-19 সংক্রমণের সময় পৃথিবীর বেশিরভাগ স্কুল, কলেজ কিংবা বিশ্ববিদ্যালয় তাদের শিক্ষাক্রম বন্ধ না রেখে



অনলাইন শিক্ষায় ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষাদান করেছেন। শিক্ষকেরা নিজ ঘরে থেকেই অনলাইনের বিভিন্ন অ্যাপ (যেমন Google Meet, WebEx, Facebook messenger, imo, Skype, Whatsapp, Zoom ইত্যাদি) ব্যবহার করে লাইভ-ক্লাসে সরাসরি শিক্ষার্থীদের পাঠদান করেছেন। অনেক সময় বিষয়ভিত্তিক ভিডিও টিউটোরিয়াল তৈরির পর অনলাইনে শেয়ার, ওয়েবসাইটের মাধ্যমে ব্লগিং করে, বিভিন্ন সামাজিক মিডিয়ার সাহায্য নিয়ে শিক্ষার্থীদের মাঝে বিতরণ করেছেন। শুধু তাই নয় একজন শিক্ষার্থী ঘরে বসে অনলাইনে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের লেকচার-ভিডিও দেখে, অ্যাসাইনমেন্ট জমা দিয়ে বিশ্বের প্রায় প্রতিটি উচ্চতর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অসংখ্য বিষয়ভিত্তিক ওয়েবসাইটের মাধ্যমে শিক্ষাগ্রহণ করতে পারছে। শিক্ষা কোনো দেশের ভৌগোলিক সীমারেখায় আবদ্ধ না থাকার কারণে বিশ্বগ্রাম ধারণায় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি শিক্ষা বিস্তারে একটি শক্তিশালী অনুঘটক হিসেবে নিজের অবস্থান সুদৃঢ় করে যাচ্ছে।

গতানুগতিক শ্রেণিকক্ষে শিক্ষাদানের পরিবর্তে অনলাইনে শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের মধ্যে ইলেকট্রনিক মাধ্যম বিশেষত কম্পিউটার, ইন্টারনেট ও ওয়েব ব্যবহার করে শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করার পদ্ধতিকে ই-লার্নিং বলে। ই-লার্নিং এমন একটি প্রযুক্তিগত শিখন পদ্ধতি যেখানে অনলাইনে শিক্ষক ও শিক্ষার্থী যে কোনো অবস্থানে থেকে পারস্পরিক মিথস্ক্রিয়ায় (interactive) পাঠদান কার্যক্রম সম্পন্ন করতে পারে। এটি সাধারণত অনলাইনে সুনির্দিষ্ট কোর্স, ডিগ্রি কিংবা প্রোগ্রাম শিক্ষায় বেশি ব্যবহৃত হয়। এ পদ্ধতি ব্যবহারে একসাথে অনেক শিক্ষার্থীকে পাঠদান সম্ভব হলেও, মানবীয় উপাদানের অনুপস্থিতির (Lack of human element) কারণে অনেক দেশেই এ ব্যবস্থা আন্তরিকতার সাথে গ্রহণ করা হচ্ছে না। তবে একটি দেশের উন্নয়ন কর্মসূচীর সাথে সম্পৃক্ত বিভিন্ন দপ্তর-বিভাগ, কর্পোরেট সংস্থাগুলোর কর্মকর্তা-কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত কার্যক্রমে এই শিক্ষা পদ্ধতির ব্যবহার যথেষ্ট কার্যকর।

### ১.১.৮ চিকিৎসা (Medical Facilities)

পৃথিবীর অনেক দেশেই দুর্গম ও প্রত্যন্ত অঞ্চলে হাসপাতাল, চিকিৎসা সুবিধা এমনকি ভালোভাবে যাতায়াতের জন্য রাস্তাঘাটও থাকে না। আবার পৃথিবীতে এমন অনেক এলাকা আছে যেখানে চিকিৎসা সেবা পাওয়া তো দূরের কথা রোগীদেরকে নিকটস্থ হাসপাতালে নিতেও দু-তিন দিন লেগে যায়। শুধু তাই নয় পৃথিবীর সবচাইতে সম্পদশালী অনেক দেশেও সর্বজনীন চিকিৎসা সেবার ব্যবস্থা নেই, জনস্বাস্থ্য অবহেলিত বলে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর পক্ষে চিকিৎসা সেবা পাওয়া সম্ভব হয় না। এ ধরনের মানুষের কাছে চিকিৎসা সুবিধা পৌঁছে দেয়ার জন্য টেলিমেডিসিন একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

টেলিমেডিসিন বলতে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির মাধ্যমে দূরবর্তী রোগীদেরকে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক দ্বারা চিকিৎসা সেবা দেওয়াকে বোঝায়। এর মূল কথা হলো তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহার করে স্বাস্থ্যসেবাকে জনগণের দোড়গোড়ায় পৌঁছে দেওয়া। বাংলাদেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে স্বাস্থ্য খাতে গত কয়েক বছর ধরে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ব্যবহার শুরু হয়েছে। নানা সীমাবদ্ধতার মধ্যেও ওয়ার্ড, ইউনিয়ন ও উপজেলা পর্যায়ে হাসপাতালগুলোয় টেলিকনফারেন্স, ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে চিকিৎসা সেবা শুরু হয়েছে এবং জনসাধারণ এর সুফল ভোগ করা শুরু করেছেন। তাছাড়া ই-মেইলের মাধ্যমে পাঠানো রোগীর চিকিৎসা সংক্রান্ত পরীক্ষা রিপোর্ট ইত্যাদি পর্যবেক্ষণ করেও রোগ নির্ণয় সহজতর হচ্ছে। অনেক সময় অনেক জটিল ধরনের অপারেশন করার ক্ষেত্রে এজন চিকিৎসক ভিডিও কনফারেন্সিংয়ের মাধ্যমে অন্য আরেকজন অভিজ্ঞ চিকিৎসকের পরামর্শ নিয়ে থাকেন। Teladoc, Maven Clinic, iCliniq, MDlive, Amwell, Doctor on Demand, treatmentonline নামীয় অসংখ্য ওয়েবসাইট রয়েছে, যেখানে বিশ্বের যে কোনো প্রান্ত থেকে অনলাইন চিকিৎসা সেবা পাওয়া যায়। ২০২০ সালে বৈশ্বিক মহামারী Covid-19 এর প্রাদুর্ভাবের সময় ব্যবস্থাপত্রসহ স্বাস্থ্যবিধি সম্পর্কিত পরামর্শ দেওয়ার জন্য প্রতিটি দেশে বেশ কিছু সুনির্দিষ্ট ফোন নম্বর

সার্বজনিক চালু রাখা হয়েছিল যার মাধ্যমে চিকিৎসকগণ নানাভাবে দেশবাসীকে প্রতিনিয়ত টেলিমেডিসিন সেবা প্রদান করেছেন।

সঠিক রোগ নির্ণয় হচ্ছে রোগীর যথাযথ চিকিৎসার পূর্বশর্ত। বর্তমান বিশ্বে রোগ নির্ণয়ের ক্ষেত্রে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিনির্ভর কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার যথাযথ প্রয়োগ দ্বারা সুস্বভাবে রোগ নির্ণয় করা সম্ভব হচ্ছে। এছাড়াও ইলেকট্রনিক হেলথ রেকর্ড (EHR: Electronic Health Record) ব্যবস্থাপনায় ডেটাবেজে রোগীর সকল তথ্য সংরক্ষিত থাকে এবং রোগী তার EHR ব্যবহার করে যে কোনো স্থান হতে তার রোগ সম্পর্কিত তথ্য, রিপোর্ট, চিকিৎসা ব্যবস্থাপত্র ইত্যাদি যে কোনো স্থানে বসে পেতে পারেন। এ ধরনের কাজ করতে যে সফটওয়্যার ব্যবহৃত হয় তার মধ্যে Therapy Notes, Epic care, Next Gen Ambulatory EHR, Care 360 ইত্যাদি অন্যতম।

### ১.১.৫ গবেষণা (Research)

যে প্রক্রিয়ায় সৃষ্টিশীল মেধা-মনন প্রয়োগ করে পৃথিবীর জ্ঞানভান্ডার বৃদ্ধি বা সমৃদ্ধ করা হয় সেটিই হচ্ছে গবেষণা। উন্নয়নের অন্যতম পূর্বশর্ত হলো গবেষণা। নিয়মিত জ্ঞানচর্চা বা বিজ্ঞানসম্মত অধ্যয়ন গবেষণার সাথে সম্পৃক্ত। উন্নতকারী দেশ মাত্রই গবেষণার জন্য বিপুল পরিমাণ অর্থ ব্যয় করে থাকে। তাই বিশ্বগ্রাস ধারণায় গবেষণা একটি প্রধান অনুষ্ঠান এবং সেজন্য এখানে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ভূমিকা অপরিহার্য। বর্তমান পৃথিবীতে তথ্য ও



চিত্র 1.2 : দেশের বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণারত তরুণ বিজ্ঞানী

যোগাযোগ প্রযুক্তির সাহায্য ছাড়া বিজ্ঞানী বা গবেষকেরা গবেষণার কথা চিন্তাও করতে পারেন না। তথ্য ও উপাত্তের সংরক্ষণ এবং প্রক্রিয়া, জটিল হিসাব, সিমুলেশন কিংবা ফলপাতি পরিচালনা এবং নিয়ন্ত্রণ, সেগুলো থেকে ডেটা সংগ্রহ এর প্রতিটি ধাপেই তথ্য প্রযুক্তি বড় ভূমিকা রেখে থাকে। বিজ্ঞানী বা গবেষকেরা তাঁদের চিন্তাধারা ইন্টারনেটের মাধ্যমে একে অন্যের কাছে প্রকাশ করতে পারেন, আলোচনা করতে পারেন কিংবা নিরবচ্ছিন্নভাবে যোগাযোগ রক্ষা করতে পারছেন। শারীরিকভাবে উপস্থিত না থেকেও একজন গবেষক সেমিনার বা কনফারেন্সে নিজের গবেষণা প্রকাশ করতে পারেন কিংবা অন্যের গবেষণা সম্পর্কে জানতে পারেন।

একসময় জার্নাল বা গবেষণাপত্র, প্যাটেন্ট ইত্যাদি অত্যন্ত দুর্লভ বিষয় ছিল, এবং সেটি ছিল গবেষণার সবচেয়ে বড় প্রতিবন্ধকতা। প্রায় সব জার্নাল আজকাল ই-জার্নাল হিসেবে প্রকাশিত হয় এবং প্যাটেন্টের বিশাল ডেটাবেসের অনেকটুকুই উন্মুক্ত, কাজেই যে কোনো গবেষক সেই বিশাল তথ্যভান্ডার ব্যবহার করতে পারেন। সে কারণে আমরা দেখতে পাই সীমিত সম্পদ নিয়েও আমাদের দেশের অনেক বিশ্ববিদ্যালয় বিশ্বমানের গবেষণা করতে পারে।

গবেষণার বিষয়বস্তু নির্দিষ্ট ওয়েবসাইট বা ব্লগে প্রকাশিত হলে গবেষণার কার্যক্রম আরো গতিশীল ও ত্বরান্বিত হয়। বিজ্ঞানী বা গবেষকদের গবেষণাপত্র ফলাফল, তথ্য-উপাত্তের যথার্থতা যাচাই এবং সমগ্র

বিশ্বের সংশ্লিষ্ট গবেষণা প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তিবর্গের নিকট দ্রুততার সাথে প্রচার এবং সেগুলোর উপর পর্যবেক্ষণ, মতামত প্রদান ইত্যাদি প্রতিটি বিষয় বিশ্বগ্রাম ধারণার মাধ্যমে বাস্তবায়ন অত্যন্ত সহজসাধ্য হয়েছে।

### ১.১.৬ অফিস (Office)

অফিস বা কর্মস্থল এমন একটি স্থান যেখানে বিভিন্ন পেশাজীবী তাদের পেশা সংশ্লিষ্ট কাজ সম্পন্ন করেন। অফিসের বর্তমান ব্যবস্থায় বিশ্বগ্রাম ধারণাটি সবচেয়ে সুন্দরভাবে প্রকাশ পায়। আমরা কোনো তথ্যের জন্য কোনো কোম্পানির অফিসে ফোন করলে বা অন্য কোনোভাবে যোগাযোগ করলে কখনোই নিশ্চিতভাবে বলতে পারব না, পৃথিবীর কোন প্রান্ত বা কোন দেশ থেকে সেই ফোনের বা সেই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হচ্ছে। শুধু তাই নয়, আধুনিক অফিস ইকুইপমেন্টস, আইসিটি ও বিভিন্ন সফটওয়্যার ব্যবহারের মাধ্যমে অফিসের সার্বিক কার্যক্রম অত্যন্ত সহজে, স্বচ্ছতা এবং দৃশ্যমান গতিশীলতার সাথে করা সম্ভব হচ্ছে। সরকারি অফিসসহ বড় বড় বহুজাতিক কোম্পানি, বিশ্ববিদ্যালয়, হাসপাতাল, গবেষণাগার, শিল্পকারখানা ইত্যাদি কর্পোরেট অফিসগুলো আজকাল ইন্টারনেটের মাধ্যমে সংযুক্ত থেকে সার্বিক স্বয়ংক্রিয়ভাবে (Automated) কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। অফিসের যাবতীয় কার্যক্রম তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির মাধ্যমে অত্যন্ত নিখুঁতভাবে আর দ্রুততার সাথে সম্পাদন করে অফিসগুলো কাগজবিহীন ডিজিটাইজড অফিসে পরিণত হয়েছে। এর ফলে বদলে যাচ্ছে অফিসের ফাইলিং সিস্টেম এবং প্রাত্যহিক কার্যপ্রক্রিয়া।

আজকের বিশ্বায়ন ব্যবস্থায় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির কল্যাণে গতানুগতিক অফিস-ব্যবস্থা একটি বড় পরিবর্তনের পথে রয়েছে। অনেকেই নিজ দেশে কিংবা অন্য দেশে থেকে বাসায় বসে কাজ করেন, অনেককেই নির্দিষ্ট কর্মঘণ্টা বজায় রাখতে হয় না। উত্তর আমেরিকার সাথে আমাদের প্রায় বারো ঘণ্টা সময়ের পার্থক্য থাকার কারণে দুই মহাদেশে দুইটি অফিস রেখে, কয়েক শিফটে সেটি দিন-রাত্রি মিলে চব্বিশ ঘণ্টা কাজ করতে পারে। ‘গুগল’ সম্পর্কে আমরা অনেকেই অবহিত আছি, ড্রপবক্স গুগল ড্রাইভ, Office 365, Google docs ইত্যাদি সার্ভিসে আমরা আমাদের যাবতীয় ফাইল তৈরিসহ নিরাপত্তার সাথে সংরক্ষণ করতে পারি এবং বিশ্বের যে কোনো প্রান্ত থেকে সেখানে কাজ করতে পারি। অফিসের সবধরনের মিটিংয়ের ক্ষেত্রে ভিডিও কনফারেন্সিং করে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা দিতে পারি।

তবে অফিস যান্ত্রিকায়নের ফলে অনভিজ্ঞ মানুষের কর্মসংস্থান কমে যায়। তেমনি গ্রাহকের সাথে ব্যবস্থাপনার মিথস্ক্রিয়া (interaction) এবং একই সাথে সহকর্মীদের সাথে সামাজিক যোগাযোগ হ্রাস পায়। জাতীয় নিরাপত্তার খাতিরে তথ্য সংরক্ষণের জন্য বড় বড় তথ্য প্রযুক্তি কোম্পানির ডেটা সেন্টারগুলো অনিয়ন্ত্রিতভাবে ব্যবহার করা হলে সবসময় একধরনের ঝুঁকি থেকে যায়।

### ১.১.৭ বাসস্থান (Residence)

বাসস্থান মানুষের মৌলিক চাহিদা। বিশ্বগ্রাম ব্যবস্থায় আজকাল অত্যাধুনিক সুযোগ-সুবিধাসমৃদ্ধ বাসভবন নির্মাণে তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার লক্ষণীয় মাত্রায় বৃদ্ধি পাচ্ছে। নিজ ঘরে অবস্থান করে দূরবর্তী দেশের আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধবদের সাথে সামান্য কথোপকথন থেকে আরম্ভ করে রিমোট কন্ট্রোলিং পদ্ধতিতে নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণ, কক্ষের তাপমাত্রা হ্রাস-বৃদ্ধি করা, লাইটিং সিস্টেম, ঘরে বসেই বাজার করা, চিকিৎসা সেবা গ্রহণ, চিত্তবিনোদন ইত্যাদি সবকিছুতেই আধুনিক তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার মানুষের জীবন-যাপন অত্যন্ত আরামদায়ক ও সহজসাধ্য করে দিয়েছে।

এ ধরনের সুবিধাসমৃদ্ধ বাসস্থানকে স্মার্ট হোম (Smart Home) এবং এর পদ্ধতিকে হোম অটোমেশন সিস্টেম (Home automation system) বলা হয়। এসব বাসস্থানে দৈনন্দিন সব ধরনের কাজে নানা ধরনের ডিভাইস যেমন— টেলিভিশন, সাউন্ড ব্যবস্থা, মিউজিক সিস্টেম, লাইট, ফ্যান, এয়ারকন্ডিশনার,



ওয়াশিং মেশিন, রেফ্রিজারেটর, মাইক্রোওয়েভ ওভেন, ফায়ার সিস্টেম, শাওয়ার সিস্টেম, পর্দা উঠানো-নামানো, গ্যারেজ সিস্টেম, ভূমিকম্প সতর্কীকরণ ব্যবস্থা, তাপ নিয়ন্ত্রক ব্যবস্থাও অন্তর্ভুক্ত থাকে। স্মার্ট হোম হলো একধরনের ওয়ান-স্টপ সার্ভিস পয়েন্টের মতো, যেখানে বসবাসের জন্য সব উপযোজন পাওয়া যায় এবং গ্রাহককে ব্যবহার্য দ্রব্যাদির গুণগতমান নিশ্চিত করে এ সংক্রান্ত সেবা প্রদান করা যায়।

স্মার্ট হোম ক্যামেরা এবং মোশন সেন্সর (Motion Censor) দিয়ে পুলিশ কন্ট্রোল রুম কিংবা প্রাইভেট সিকিউরিটি কোম্পানির সাথে যুক্ত থাকে বলে বাসস্থানটি সার্বক্ষণিক নজরদারিতে থাকে এবং বাসস্থানের নিরাপত্তা সুরক্ষিত হয়। বাসস্থানে কোনো প্রতিবন্ধী ব্যক্তি থাকলে স্মার্ট হোম তার জন্য সত্যিকারের সহায়তা হতে পারে, কণ্ঠস্বরের মাধ্যমে (ভয়েস কমান্ড) দরজা খোলা বা বন্ধ করা, লাইট, কম্পিউটার ও টেলিফোন চালু কিংবা বন্ধ করা ইত্যাদি কাজ তখন সহজেই করা সম্ভব হয়ে যায়।

হোম অটোমেশনে ব্যাপক আর্থিক বিনিয়োগ, রক্ষণাবেক্ষণের জন্য দক্ষ জনবল, ব্যক্তিগত গোপনীয়তায় হস্তক্ষেপ, কণ্ঠস্বর বা ভয়েস নিয়ন্ত্রিত ডিভাইস ব্যবহারে বিভ্রম ইত্যাদি সীমাবদ্ধতা থাকা সত্ত্বেও এর জনপ্রিয়তা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে।

### ১.১.৮ ব্যবসা-বাণিজ্য (Business)

পৃথিবীর কোনো দেশ এখন আর পরিপূর্ণভাবে স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়, প্রত্যেকটি দেশকেই কোনো না কোনো দ্রব্যের জন্য অন্যান্য দেশের উপর নির্ভর করতে হয়। যে দেশ যেটি উৎপাদন করে সেই দেশ সেটি রপ্তানি করে, এবং যে দেশে যেটি প্রয়োজন সেটি অন্য দেশ থেকে আমদানি করে। সে কারণে ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে আমরা বিশ্বগ্রামের ধারণাটি পরিপূর্ণভাবে বিকশিত হতে দেখি। শক্তিশালী অর্থনৈতিক ব্যবস্থার উপর দেশের উন্নয়ন নির্ভরশীল। ব্যবসা-বাণিজ্যের মাধ্যমে অর্থনৈতিক উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় বিশ্বগ্রাম ব্যবস্থা ব্যাপক ভূমিকা পালন করে চলেছে। তথ্য প্রযুক্তির প্রভাবে আজকাল ব্যবসা-বাণিজ্যেও অভাবনীয় পরিবর্তনের সূচনা হয়েছে। ক্রেতা-বিক্রেতাকে তাদের উৎপাদিত পণ্য ক্রয়-বিক্রয়ের জন্য অন্যত্র যেতে হয় না। উৎপাদিত পণ্য বা সেবার গুণগতমান অনলাইনের মাধ্যমে স্থানীয় এবং বিশ্ববাজারে ছড়িয়ে দেয়া সম্ভব হচ্ছে। ক্রেতা বা ভোক্তাগণ তাদের প্রয়োজন অনুযায়ী পণ্য ক্রয় করতে সক্ষম হচ্ছেন। তাই ব্যবসা-বাণিজ্য আজকাল আর ভৌগোলিক সীমানায় আবদ্ধ নেই। বিশ্বব্যাপী ই-কমার্স, ই-বিজনেস, অনলাইন শপিং-এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ। ইলেকট্রনিক্স কমার্স বা ই-কমার্সই এ যাত্রার পথিকৃৎ হিসেবে বিবেচিত।

আধুনিক ডেটা প্রসেসিং এবং কম্পিউটার নেটওয়ার্ক বিশেষত ইন্টারনেটের মাধ্যমে ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে পণ্য বা সেবা বিপণন, বিক্রয়, সরবরাহ, ব্যবসা সংক্রান্ত লেনদেন ইত্যাদি কাজকে সম্মিলিতভাবে ইলেকট্রনিক কমার্স বা ই-কমার্স বলে। ই-কমার্স ওয়েব সাইটে পণ্যের গুণগত মান, বর্ণনা, ছবি ও মূল্য সম্পর্কিত তথ্য উল্লেখ থাকে। ই-কমার্সের পরিচিত কতকগুলো ওয়েব সাইট হলো, [www.bikroy.com](http://www.bikroy.com), [www.daraz.com](http://www.daraz.com), [www.alibaba.com](http://www.alibaba.com), [www.amazon.com](http://www.amazon.com) ইত্যাদি।

বাংলাদেশে বিভিন্ন সীমাবদ্ধতার মাঝেও ইতোমধ্যে ই-কমার্সের কার্যক্রম চালু হয়েছে। ইদানীং সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমগুলোয় অনেক ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান তাদের স্থানীয় শেয়ার বাজারের তথ্য এবং উৎপাদিত পণ্যের প্রচার এবং নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রীর হোম ডেলিভারির বিজ্ঞাপন করে থাকেন। এতে করে উৎপাদিত পণ্যের বাজার দেশের গন্ডি ছাড়িয়ে আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে তুলে ধরা যায় এবং বৈশ্বিক ব্যবসা-বাণিজ্যের সুফল আমরা পেতে পারি। প্রযুক্তি শেয়ার ও স্থানান্তরের মাধ্যমে উন্নত হবে শিল্প কারখানাগুলো। বিশ্বমানের ব্যবস্থায় উৎপাদিত পণ্য হবে আন্তর্জাতিক মানের। ফলে সম্প্রসারিত হবে বৈশ্বিক ব্যবসা-বাণিজ্যের। এক্ষেত্রে লেনদেনে ব্যবহৃত হয় ইএফটি (EFT: Electronic fund transfer) যেটি এক ধরনের



ইলেকট্রনিক লেনদেন যা সংঘটিত হয় কম্পিউটার ও নেটওয়ার্কের সাহায্যে। একই ব্যাংকের বিভিন্ন শাখার অ্যাকাউন্টের মধ্যে অথবা বিভিন্ন আর্থিক প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন অ্যাকাউন্টের মধ্যে, কিংবা বৈদেশিক ব্যাংকের মধ্যেও এ ধরনের লেনদেন করা যায়। এছাড়া ইন্টারনেটের মাধ্যমে প্রায় প্রতিটি ব্যাংকের আর্থিক লেনদেন সম্পন্ন করা যায়। অনলাইন ব্যাংকিং নামে পরিচিত এই পদ্ধতিটিকে বর্তমান তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির অন্যতম পরিষেবা হিসেবে গণ্য করা যায়। এ ধরনের পদ্ধতিতে লেনদেনকে ইন্টারনেট ব্যাংকিংও বলা হয়। এই ব্যাংকিং ব্যবস্থাপনায় গ্রাহকগণকে লেনদেন সম্পন্ন করার জন্য সশরীরে কোনো ব্যাংক শাখায় যাওয়ার প্রয়োজন হয় না; বাড়িতে বা কর্মস্থলে কিংবা ভ্রমণের অবস্থাতেও এই কার্যক্রম সম্পন্ন করা যায়। এছাড়া শুধু কম্পিউটার বা স্মার্ট ফোন, ইন্টারনেট সংযোগ এবং সংশ্লিষ্ট ব্যাংকের ডেবিট বা ক্রেডিট কার্ড প্রয়োজন হয়।

### ১.১.৯ সংবাদ (News)

সংবাদ বিশ্বগ্রাম খান্নায় একটি অন্যতম প্রধান উপাদান। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ব্যবহার সংবাদ ও গণমাধ্যমের কার্যক্রমে গতিশীলতা বেড়ে গেছে বহুগুণে, যোগ করেছে ভিন্নমাত্রা। ব্যাপক হারে বিস্তৃতি পেয়েছে এর কর্মসূচি। পৃথিবীর যে কোনো প্রান্তে ঘটে যাওয়া একটি ঘটনা মুহূর্তের মাঝে সারা পৃথিবীর সকল মানুষ



চিত্র 1.3 : বাংলাদেশে প্রকাশিত কিছু দৈনিক সংবাদপত্র

জেনে যেতে পারে। বিশ্বের গুরুত্বপূর্ণ করেকটি নিউজ চ্যানেল, যেমন এপি, রয়টার্স, বিবিসি, সিএনএন বা আলজাজিরা ইত্যাদি তাদের নেটওয়ার্কের মাধ্যমে সারা বিশ্বে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা সংবাদগুলো আমাদের দোরগোড়ায় পৌঁছে দিচ্ছে। প্রাকৃতিক দুর্যোগ, যুদ্ধ কিংবা দুর্ভিক্ষের সংবাদ সারা পৃথিবীর মানুষের মাঝে বিশ্বভ্রাতৃত্ব এবং সহমর্মিতার জন্ম দেয়। ২০২০ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে করোনাভাইরাসের বিস্তৃতি যে আন্দোলন গড়ে উঠেছিল সেটি দেখতে দেখতে পৃথিবীর অন্যান্য দেশে বিস্তৃতি লাভ করেছিল।

এর ধারাবাহিকতায় আমাদের গণমাধ্যমেও সম্প্রসারণ, ক্রমবিস্তৃতি লাভ করেছে। অনলাইন সাংবাদিকতার সুযোগগুলো আমরা কাজে লাগাতে পারছি। খবরের যথার্থতা নির্ণয়ে আমরা প্রতিনিয়তই বিভিন্ন চ্যানেলের সংবাদ যাচাই করতে পারি। আমাদের দেশেও অনলাইন নিউজ সাইটগুলো সমসাময়িক বিশ্বের সকল খবরাখবর প্রচার করে চলেছে। এছাড়াও বর্তমানে প্রায় সব খবরের কালজ তাদের অনলাইন সংস্করণ নিয়মিতভাবে প্রকাশ করছে। মোবাইল ফোন কোম্পানিগুলোও সার্ভিস চার্জের বিনিময়ে আপডেট নিউজ প্রচার করছে। সংবাদগুলো বৈশ্বিক হওয়ায় সারা বিশ্ব পরিণত হচ্ছে এক পরিবারে। তথ্যের সমৃদ্ধতা যে কোনো দেশকে উন্নত করতে পারে। বর্তমানে তথ্যই শক্তি, যার অন্যতম প্রধান উৎস এই সংবাদপত্র যার উপর ভিত্তি করে চলবে নিরন্তর গবেষণা, নিশ্চিত হবে টেকসই উন্নয়নের অসীম সম্ভাবনা।

তবে ইন্টারনেটভিত্তিক ওই সব পোর্টাল তৈরি করা, কিংবা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে সংবাদ প্রচার করা খুবই সহজ হয়ে যাওয়ার কারণে এর যথেষ্ট অপব্যবহার হতে দেখা যায়। মিথ্যা সংবাদ কিংবা বিদ্বেষমূলক প্রচারণা এখন সারা পৃথিবীর জন্য বড় সমস্যা। এর মোকাবেলা করার জন্য আমাদের দেশে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাসম্পন্ন (আর্টিফিসিয়াল ইন্টেলিজেন্স) নিজস্ব নিউজ সার্ভার, শক্তিশালী ডেটাবেজ, নেটওয়ার্ক ও নিরাপত্তা ব্যবস্থা সম্প্রসারণ করা প্রয়োজন।

### ১.১.১০ বিনোদন ও সামাজিক যোগাযোগ (Entertainment and Social Communication)

বিনোদন ছাড়া মানুষের জীবনের উল্লেখযোগ্য অংশ অপূর্ণ থেকে যায়। সভ্যতার উন্মেষ থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত বিনোদনের অনুষ্ণের মধ্যে গল্প বলা, বাদ্য বাজানো, নৃত্য, গান, নাটক ইত্যাদি প্রাধান্য পেয়ে আসছে। বর্তমানে বিনোদনের অধিকাংশই হয়ে পড়ছে ইলেকট্রনিক যন্ত্রনির্ভর; যেমন টেলিভিশন, রেডিও, মোবাইল, ইন্টারনেট ইত্যাদি। স্যাটেলাইট বা ইন্টারনেটের কল্যাণে এবং যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতির কারণে এখন ঘরে বসেই পৃথিবীর যে কোনো অনুষ্ঠান উপভোগ করা সম্ভব। হলিউডের সিনেমা একসময় চলচ্চিত্র জগতে অপ্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে বিবেচিত হতো। এখন স্ট্রিমিং করে ইন্টারনেটে চলচ্চিত্র দেখার প্রতিষ্ঠান নেটফ্লিক্স হলিউডকে সরাসরি চ্যালেঞ্জ করার পর্যায়ে চলে গেছে। এ ছাড়াও ইন্টারনেট গেমিং, আইপি টিভি (ইন্টারনেট প্রটোকল টিভি), ইউটিউবসহ আরো অসংখ্য অনলাইন বিনোদন মাধ্যম রয়েছে যেগুলো যে কোনো ব্যক্তি তার পছন্দসই গেম, ভিডিও, গান ইত্যাদি পর্যবেক্ষণ ও ডাউনলোড করতে পারে। একটা সময় ছিল যখন সকল বিনোদনের অনুষ্ঠান তৈরি হতো জাতীয় কৃষ্টি কালচার ও সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপটকে বিবেচনা করে। তথ্য প্রযুক্তির প্রভাবে এবং বিশ্বায়নের এ যুগে সেখানেও বৈচিত্র্য এসেছে। বিশ্বগ্রামের চেতনার সাথে তাল মিলিয়ে এক দেশের মানুষ অন্য দেশের ধ্যানধারণা, চিন্তা, সংস্কৃতির ছোঁয়ার সাথে পরিচিত হচ্ছে।

অনলাইন নিউজ, টিভি প্রোগ্রাম, গান, নাটক, চলচ্চিত্র ইত্যাদি যে কোনো ব্যক্তি যে কোনো স্থানে মুহূর্তের মধ্যেই নিজের স্মার্ট ফোনের মাধ্যমে দেখতে ও উপভোগ করতে পারছেন। জনপ্রিয় সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমগুলো যেমন ফেসবুক, টুইটার, হোয়াটসঅ্যাপ, ইন্সটাগ্রাম, ম্যাসেঞ্জার, স্কাইপি ইত্যাদি ব্যবহার করে সারা বিশ্বের যে কোনো প্রান্তের সাথে যোগাযোগসহ বিনোদন জগতের আপডেট তথ্য, ভিডিও, ছবি খুব সহজেই পর্যবেক্ষণ এবং ‘লাইক’-এর মাধ্যমে জনমত যাচাই করতে পারছেন। ডিজিটাল সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে যে কোনো ব্যক্তি তার ভালো লাগা বা মন্দ লাগা বিষয়ে নিজের মতামত দেওয়া, মতবিনিময় কিংবা অন্যকে শেয়ার করতে পারায় বৈশ্বিক যোগাযোগ সৃষ্টি হচ্ছে।

তবে এক্ষেত্রে আমাদের সকলের সতর্ক হওয়া প্রয়োজন। ভিন্ন সংস্কৃতির ছোঁয়ায় স্বদেশীয় জাতিসত্তা যেন হারিয়ে না যায় তা নিশ্চিত করা প্রয়োজন। তা ছাড়াও আজকাল সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম, মাদকশক্তির অপব্যবহারের ন্যায় আশঙ্কাজনকভাবে বেড়ে যাচ্ছে, ভাটা পড়ছে পারিবারিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে। কর্মস্থল এবং শিক্ষাক্ষেত্রেও বিরূপ প্রভাব পড়ছে, সেইসাথে ব্যক্তিগত তথ্যে অযাচিত হস্তক্ষেপ, একজনের ছবি বা তথ্য অন্য নামে চালিয়ে দেয়া কিংবা অপপ্রচার ও গুজব সমাজে ছড়িয়ে চরম বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করার ঘটনাও নিয়মিতভাবে ঘটছে।

### ১.১.১১ সাংস্কৃতিক বিনিময় (Exchange of Cultural Activities)

মানব সভ্যতার অগ্রগতিতে সংস্কৃতি এবং সৃজনশীলতার ভূমিকা অনস্বীকার্য। ইতিহাস পর্যালোচনায় এটি নানাভাবে প্রমাণিত হয়েছে। প্রযুক্তিগত ও অর্থনৈতিক উন্নতির সাথে সাথে বিভিন্ন জাতি-গোষ্ঠীর নিজস্ব সংস্কৃতির উন্নয়ন ও সমৃদ্ধিও উল্লেখ করার মতো। আমাদের বাংলা ভাষা হাজার বছর আগে এখনকার মতো ছিল না। কালের বিবর্তনে এ ভাষা বর্তমান রূপ পরিগ্রহ করেছে। বর্তমান বিশ্বায়ন ব্যবস্থার প্রভাব সাংস্কৃতিক পরিমন্ডলেও ব্যাপকভাবে পরিলক্ষিত হচ্ছে। একসময় আমাদের দেশে “ভালোবাসা দিবস” বলে কোনো দিবস পালিত হতো না, এখন এদেশের তরুণদের কাছে এটি জনপ্রিয় একটি দিবস। আজকের বাংলাদেশি একজন কিশোর এবং একজন মার্কিন কিশোর একই সময়ে, একই ধরনের প্রযুক্তি এবং পদ্ধতি ব্যবহারে অভ্যস্ত হয়ে গেছে। ফলে একইভাবে যে কোনো বিষয় অবলোকন, চিন্তাভাবনা, মতবিনিময় করতে সক্ষম হচ্ছে। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির কল্যাণে ভিন্ন জাতি, বর্ণ, ধর্মের মানুষ একটি একক সমাজে বসবাসের ফলে মানুষের



যোগাযোগের ব্যাপকতা এবং বিশ্বের সকল সংস্কৃতির মানুষের সাথে পরিচিত হওয়া সুযোগ ঘটেছে, যেটি বিশ্বগ্রামের ধারণার সাথে পুরোপুরি সংগতিপূর্ণ।



চিত্র 1.4 : সাংস্কৃতিক বিনিময়ের কারণে এখন পৃথিবীর যে কোনো দেশের মানুষের পক্ষে অন্যদের দেশের নৃত্যশিল্পীদের নৃত্য দেখা সম্ভব

অবশ্য এর বিরূপ প্রভাবও দৃষ্টি করা যাচ্ছে। সাংস্কৃতিক আত্মসনের সুখে পড়ছে গিছিয়ে থাকা দেশগুলোর ভাষা ও সংস্কৃতি। বিলুপ্ত হতে বসেছে অনেক ঐতিহ্য ও বৈচিত্র্যময় সংস্কৃতি। আমাদের দেশের বৈচিত্র্যময় সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যও রিসিক্স, ফিউশন কিংবা পপ-কালচারের কৃত্তিকারক প্রভাবে প্রভাবাধিত হচ্ছে। একেত্রে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ক্ষেত্রে দক্ষতা অর্জন করে নিজস্ব সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড এবং ঐতিহ্যগত দিক রপ, ওয়েবসাইট, চ্যানেল ইত্যাদিতে তুলে ধরতে হবে। ব্যাপক প্রচার-প্রচারণা, সুস্থ ও আকর্ষণীয় বিনোদনমূলক অনুষ্ঠান প্রচার এবং এ বিষয়ে সচেতনতামূলক ও আলোচনামূলক কাজ চালিয়ে যেতে হবে। তাহলেই বৈশ্বিক সাংস্কৃতিক বিদ্যায়নে আমাদের সংস্কৃতি স্বমহিমায় জাগরণ করে নিতে পারবে।

## ১.২ ভার্চুয়াল রিয়েলিটি (Virtual Reality)

ভার্চুয়াল রিয়েলিটি শব্দের আক্ষরিক অর্থ হচ্ছে কৃত্রিম বাস্তবতা, অর্থাৎভাবে শব্দ দুটি যদিও স্ববিরোধী কিছু তথ্য প্রযুক্তির ক্ষেত্রে এটি এমন এক ধরনের পরিবেশ তৈরি করে যেটি বাস্তব নয় কিছু বাস্তবের মতো চেতনা সৃষ্টি করে এবং মস্তিষ্কে একটি বাস্তব অনুভূতি জাগায়। আমরা জানি, স্পর্শ, শোনা কিংবা দেখা থেকে মানুষের মস্তিষ্কে একটি অনুভূতির সৃষ্টি হয় যেটাকে আমরা বাস্তবতা বলে থাকি। কতকগুলো যন্ত্রের সাহায্যে যদি আমরা এই অনুভূতিগুলো সৃষ্টি করতে পারি তাহলে অবশ্যই মানুষের কাছে পুরোপুরি বাস্তব মনে হতে পারে। এটি নানাভাবে করা সম্ভব। অনেক সময় বিশেষ ধরনের চশমা বা হেলমেট পরা হয়, যেখানে দুই চোখে দুটি ভিন্ন দৃশ্য দেখিয়ে ত্রিমাত্রিক অনুভূতি সৃষ্টি করা হয়। অনেক সময় একটি স্ক্রিনে ভিন্ন ভিন্ন প্রজেক্টর দিয়ে ভিন্ন ভিন্ন দৃশ্য দেখিয়ে সেই অনুভূতি সৃষ্টি করা হয়। এই প্রক্রিয়াগুলো সম্পাদন করার জন্য মূলত কম্পিউটারের সাহায্য নিয়ে হার্ডওয়্যার ও সফটওয়্যারের সমন্বয়ে কোনো একটি পরিবেশ বা ঘটনার বাস্তবভিত্তিক ত্রি-মাত্রিক চিত্রায়ণ করা হয়। তাই বলা যায় ভার্চুয়াল রিয়েলিটি হলো হার্ডওয়্যার ও সফটওয়্যারের মাধ্যমে তৈরিকৃত এমন এক ধরনের কৃত্রিম পরিবেশ বা উপস্থাপন করা হলে ব্যবহারকারীদের কাছে এটিকে বাস্তব পরিবেশ মনে হয়।

ভার্চুয়াল রিয়েলিটির পরিবেশ তৈরির জন্য শক্তিশালী কম্পিউটারে সংবেদনশীল গ্রাফিক্স ব্যবহার করতে হয়। সাধারণ গ্রাফিক্স আর ভার্চুয়াল জগতের গ্রাফিক্সের মধ্যে তফাত হলো এখানে শব্দ এবং স্পর্শকেও যথেষ্ট গুরুত্ব দেয়া হয়। ব্যবহারকারীরা যা দেখে এবং স্পর্শ করে তা বাস্তবের কাছাকাছি বোঝানোর জন্য বিশেষভাবে তৈরি চশমা বা হেলমেট



চিত্র 1.5 : বাংলাদেশের উত্তরতর তৈরি সফটওয়্যার মূলতের ভিত্তিতে গণসং

(HMD: Head Mounted Display) ছাড়াও অনেক সময় হ্যান্ড গ্রাভিস, বুট, সুট ব্যবহার করা হয়। উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন কম্পিউটারে গ্রাফিক্স ব্যবহারের মাধ্যমে দূর থেকে পরিচালনা করার প্রক্রিয়াটি সম্পন্ন হয়। একে টেলিপ্রেশেন্স বলা হয়। এছাড়াও এ পদ্ধতিতে বাস্তবভিত্তিক শব্দও সৃষ্টি করা হয়, যাতে মনে হয়, শব্দগুলো বিশেষ কোনো স্থান হতে উৎসারিত হচ্ছে।

### ১.২.১ প্রাত্যহিক জীবনে ভার্চুয়াল রিয়েলিটির প্রভাব (Impact of Virtual Reality in everyday life)

বিনোদন ক্ষেত্রে : নানা ধরনের বিনোদনের মাধ্যমে সাধারণ মানুষ ভার্চুয়াল রিয়েলিটির সাথে সবচেয়ে বেশি পরিচিত হওয়ার সুযোগ পেয়েছে। ত্রিমাত্রিক পদ্ধতিতে নির্মিত ভার্চুয়াল রিয়েলিটি নির্ভর কল্পকাহিনি, পৌরাণিক কাহিনি, কার্টুন, ঐতিহাসিক চলচ্চিত্র ইত্যাদি মানুষের কাছে জনপ্রিয়তা ও গ্রহণযোগ্যতা পেয়েছে। আজকালকার প্রায় প্রতিটি চলচ্চিত্রে ভার্চুয়াল রিয়েলিটির ব্যবহার দেখা যায়। ভার্চুয়াল রিয়েলিটি ব্যবহার করে নানা ধরনের কম্পিউটার গেম সাধারণ মানুষের কাছে জনপ্রিয়তা পেয়েছে। মিউজিয়াম বা ঐতিহাসিক যেসব জায়গায় ভ্রমণ করা সবার পক্ষে সম্ভব হয় না, ভার্চুয়াল রিয়েলিটি পদ্ধতি ব্যবহার করে সেইসব জায়গায় ভ্রমণ করার অনুভূতি পাওয়া সম্ভব হয়। সাম্প্রতিক সময়ে অগমেন্টেড রিয়েলিটি (Augmented Reality) নামে ভার্চুয়াল রিয়েলিটির একটি নতুন রূপ জনপ্রিয়তা পেতে শুরু করেছে, যেখানে বাস্তব জগতের সাথে ভার্চুয়াল জগতের এক ধরনের সংমিশ্রণ ঘটানো হয়।



চিত্র 1.6 : বৈমানিকদের বিমান চালানোর প্রশিক্ষণের জন্য ফ্লাইট সিমুলেটর

যানবাহন চালানো ও প্রশিক্ষণে : ভার্চুয়াল রিয়েলিটির সবচেয়ে বাস্তবমুখী ব্যবহার হয়ে থাকে ফ্লাইট সিমুলেটরে যেখানে বৈমানিকরা বাস্তবে আসল বিমান উড্ডয়নের পূর্বেই বিমান পরিচালনার বাস্তব জগৎকে অনুধাবন করে থাকেন। এ ছাড়াও মোটরপাড়ি, জাহাজ ইত্যাদি চালানোর প্রশিক্ষণে সংশ্লিষ্ট সিমুলেটর ও মডেলিং সফটওয়্যারের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ-সংশ্লিষ্ট কৃত্রিম পরিবেশ তৈরি করে বাস্তবের ন্যায় প্রশিক্ষণ দেয়া হয়ে থাকে।

শিক্ষা ও পবেষণায় : বাস্তবে কোনো কাজ করার আগে কম্পিউটারে কৃত্রিমভাবে প্রয়োগ করে দেখাকে সিমুলেশন বলা হয়। শিখন-শেখানো কার্যক্রমে জটিল বিষয়গুলো ভার্চুয়াল রিয়েলিটির মাধ্যমে সিমুলেশন ও মডেলিং করে শিক্ষার্থীদের সামনে সহজবোধ্য ও চিত্তাকর্ষকভাবে উপস্থাপন করা যায়। পবেষণালব্ধ ফলাফল বিশ্লেষণ ও উপস্থাপন, জটিল অণুর আণবিক গঠন, ডিএনএ গঠন যা কোনো অবস্থাতেই বাস্তবে অবলোকন সম্ভব নয় সেগুলো ভার্চুয়াল রিয়েলিটির পরিবেশে সিমুলেশনের মাধ্যমে দেখা সম্ভব হচ্ছে।

চিকিৎসাক্ষেত্রে : চিকিৎসাবিজ্ঞানের সুবৃহৎ পরিসরে এর ব্যবহার ব্যাপক। জটিল অপারেশন, কৃত্রিম অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সংযোজন, ডিএনএ পরীক্ষা ইত্যাদিসহ নবীন শল্য চিকিৎসকদের প্রশিক্ষণ ও রোগ নির্ণয়ে ব্যাপক হারে ভার্চুয়াল রিয়েলিটি ব্যবহৃত হয়।

সামরিক প্রশিক্ষণে : ভার্চুয়াল রিয়েলিটির মাধ্যমে সত্যিকার যুদ্ধক্ষেত্রের আবহ তৈরি করে সৈনিকদেরকে উন্নত ও নিখুঁত প্রশিক্ষণ প্রদান করা যায়। সত্যিকারের যুদ্ধকাণ্ডীন বিশৃঙ্খলক পরিস্থিতিতে সৈনিকেরা তাদের সঠিক করণীয় সম্পর্কে আগেই পরিচিত হওয়ার সুযোগ পেয়ে থাকে।



**ব্যবসা বাণিজ্যে :** উৎপাদিত কিংবা প্রস্তুত পণ্যের গুণগত মান, গঠন, বিপণন, সম্ভাব্যতা যাচাই, মূল্যায়ন, বিপণন কর্মী প্রশিক্ষণ ইত্যাদি সব ধরনের কার্যক্রমে ভার্চুয়াল রিয়েলিটির সিমুলেশন পদ্ধতি ব্যবহৃত হয়। কোনো বিপজ্জনক ও ক্ষতিকর দ্রব্য বাজারজাত করার আগে কোনো কর্মচারীর জীবনের ঝুঁকি না নিয়ে ভার্চুয়াল রিয়েলিটির পরিবেশে সেগুলো পরীক্ষা করে নেওয়া সম্ভব হয়।

এখানে উল্লেখ্য যে, ভার্চুয়াল রিয়েলিটির অনেক বাস্তব ব্যবহার থাকার পরেও কমবয়সি বা শিশুদের বেলায় এর যথেষ্ট ব্যবহার নিয়ে সতর্ক থাকার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। গবেষণায় দেখা গেছে একজন প্রাপ্তবয়স্ক যেভাবে ভার্চুয়াল রিয়েলিটির পরিবেশে প্রতিক্রিয়া করে সে তুলনায় একজন কমবয়সির প্রতিক্রিয়া অনেক তীব্র এবং দীর্ঘস্থায়ী। শুধু তাই নয় এর যথেষ্ট ব্যবহার তাদের শিখন ক্ষমতার উপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে।

### ১.৩ তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির সাম্প্রতিক প্রবণতা (Contemporary trends of ICT)

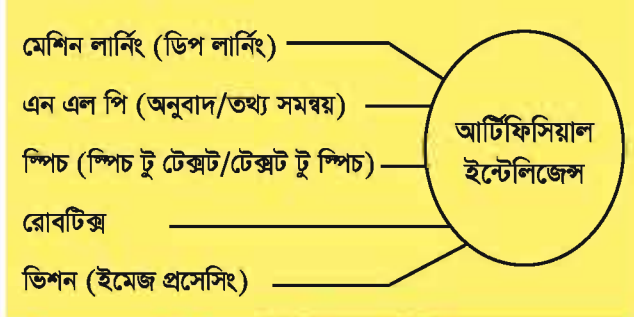
বাস্পীয় শক্তির ব্যবহার দিয়ে প্রথম শিল্পবিপ্লবের শুরু হয়েছিল, বৈদ্যুতিক শক্তির ব্যাপক ব্যবহার ছিল দ্বিতীয় শিল্পবিপ্লব। ইলেক্ট্রনিক্স এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ব্যবহার দিয়ে নতুন একটি (মতান্তরে একাধিক) শিল্পবিপ্লব শুরু হয়েছে। যে সমস্ত দেশ আগের শিল্পবিপ্লবে অংশ নিয়েছিল তারা পরবর্তীকালে পৃথিবীর নেতৃত্ব দিয়েছিল। একই ধারাবাহিকতায় আমরা বলতে পারি যারা এই তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির শিল্পবিপ্লবে অংশ নেবে তারা ভবিষ্যতে পৃথিবীর নেতৃত্ব দেবে। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির এই বিকাশ পৃথিবীর সকল মানুষের জীবনকে কোনো না কোনোভাবে স্পর্শ করেছে। এই প্রযুক্তিটি মানুষের বুদ্ধিবৃত্তির উপরে অনেকখানি নির্ভর করে, কাজেই প্রথমবারের মতো এটি পৃথিবীর ধনী-দরিদ্র, সম্পদশালী কিংবা সম্পদহীন, অগ্রসর অথবা অনগ্রসর সকল জাতির জন্য সমান সুযোগের সৃষ্টি করেছে। যে জাতি যতটুকু আগ্রাসী হয়ে এই প্রযুক্তিকে গ্রহণ করবে সেই জাতি তত লাভবান হবে। আশার কথা হচ্ছে সীমিত সামর্থ্যের মধ্যে থেকেও আমাদের দেশ ‘ডিজিটাল বাংলাদেশ’ হিসেবে এই প্রযুক্তি বাস্তবায়ন করার চেষ্টা করে যাচ্ছে।

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির সাম্প্রতিক প্রবণতা যেসব ক্ষেত্রকে খুব বেশি প্রভাবিত করছে সেগুলো নিচে বর্ণনা করা হলো :

#### ১.৩.১ আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স (Artificial Intelligence)

চিন্তাশক্তি, বুদ্ধি কিংবা বিশ্লেষণ ক্ষমতা মানুষের সহজাত, একটি যন্ত্রকে মানুষের মতো বুদ্ধিমত্তা দিয়ে, সেটিকে চিন্তা করানো কিংবা বিশ্লেষণ করানোর ক্ষমতা দেওয়ার খারণাটিকে সাধারণভাবে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স বা কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বলা হয়। কিছুদিন আগেও কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বা আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স ছিল দূর ভবিষ্যতের একটি কাল্পনিক বিষয়। কিন্তু অতি সম্প্রতি এই দূরবর্তী ভবিষ্যতের বিষয়টি আমাদের দৈনন্দিন জীবনের অংশ হতে শুরু করেছে। তার প্রধান কারণ, পৃথিবীর মানুষ ডিজিটাল বিশ্বে এমনভাবে সম্পৃক্ত হয়েছে যে, হঠাৎ করে অচিন্তনীয় পরিমাণ ডেটা সৃষ্টি হয়েছে এবং সেই ডেটাকে প্রক্রিয়া করার মতো ক্ষমতাসালী কম্পিউটার আমাদের হাতে চলে এসেছে।

এই ডেটা বা তথ্যকে প্রক্রিয়া করার জন্য অনেক সময় সাধারণ কম্পিউটার প্রোগ্রাম যথেষ্ট নয়, এমন অ্যালগরিদম বা পদ্ধতি প্রয়োজন যার মাধ্যমে কম্পিউটার চিন্তা করে কোনো সমাধান বের করতে পারে এবং পরিবর্তিত পরিস্থিতির সাথে নিজেকে খাপ খাইয়ে নিতে পারে ঠিক যেমনটা মানুষ বা অন্যান্য বুদ্ধিমান প্রাণী করে থাকে। এ ধরনের পদ্ধতি এবং অ্যালগরিদম নিয়েই আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স কাজ করে থাকে। আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সের আওতায় বেশ কিছু ক্ষেত্র রয়েছে, যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে: মেশিন লার্নিং, রোবটিক্স,



চিত্র ১.৭ : আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সের বিভিন্ন ক্ষেত্র এবং তার উদাহরণ

কম্পিউটার ভিশন, ন্যাচারাল ল্যাঙ্গুয়েজ প্রসেসিং (NLP), স্পিচ প্রসেসিং ইত্যাদি। মেশিন লার্নিং-এর কাজ হচ্ছে এমনভাবে কম্পিউটারকে প্রশিক্ষণ দেয়া যেন সে কোনো সিস্টেম সম্পর্কে বিভিন্ন নিয়ম নিজেই শিখতে পারে এবং নিজের ভুল থেকে শিক্ষা নিয়ে পরে তা কাজে লাগাতে পারে। রোবোটিক্স হচ্ছে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স কাজে লাগিয়ে একটি রোবট বা যন্ত্রকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে কাজ করানোর

বিদ্যা। ন্যাচারাল ল্যাঙ্গুয়েজ প্রসেসিং দ্বারা মানুষ সচরাচর যেসব ভাষা ব্যবহার করে (যেমন: বাংলা, ইংরেজী, আরবী) সেসব ভাষায় কম্পিউটারের সাথে তথ্য আদান-প্রদান করার ব্যবস্থা করা হয়। কম্পিউটার ভিশন হচ্ছে ক্যামেরা দিয়ে একটা মেশিন যা দেখতে পায় তা থেকে বিভিন্ন তথ্য প্রক্রিয়া করার উপায় ঠিক যেমনটা মানুষ চোখ দিয়ে করে থাকে। আর স্পিচ প্রসেসিং হচ্ছে মূলত কম্পিউটারকে দিয়ে কথা বলানো ও শোনানোর কৌশল।

আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সের কাজে ব্যবহার করার জন্য বিজ্ঞানী ও প্রযুক্তিবিদরা নানা ধরনের পদ্ধতি আবিষ্কার করেছেন। তার মধ্যে অন্যতম জনপ্রিয় ও বহুল ব্যবহৃত একটি পদ্ধতি হচ্ছে নিউরাল নেটওয়ার্ক যা কিছুটা মানুষের মস্তিষ্কের মতো কাজ করে। তোমরা নিশ্চয়ই জানো যে মানবমস্তিষ্কে আছে অসংখ্য নিউরন, যারা পরস্পরের সাথে তথ্য আদান-প্রদান করে বলেই মানুষ চিন্তা করতে পারে এবং বিভিন্ন অনুভূতি বোধ করতে পারে। কম্পিউটারের জন্য গাণিতিকভাবে এমন কিছু কৃত্রিম নিউরন তৈরি করা হয়, যাকে পারসেপট্রন (perceptron) বলা হয়ে থাকে। এই কৃত্রিম নিউরনগুলোকে বিভিন্ন স্তরে সাজিয়ে এদের মধ্যে যোগাযোগ স্থাপন করে যে নেটওয়ার্ক তৈরি হয়, তাকেই নিউরাল নেটওয়ার্ক বলে। নিউরাল নেটওয়ার্কের কাজ হচ্ছে কিছু ইনপুট থেকে একটা নির্দিষ্ট আউটপুট কিভাবে পাওয়া যেতে পারে তেমন একটা ফাংশন শেখা। সাধারণত একটি নিউরাল নেটওয়ার্ক তিনটি স্তর থাকে - ইনপুট স্তর, লুক্কায়িত স্তর (hidden layer) ও আউটপুট স্তর। নাম শুনেই বোঝা যাচ্ছে যে ইনপুট আর আউটপুট স্তরের কাজ হচ্ছে কম্পিউটারকে যে ফাংশনটা শেখানো হবে যথাক্রমে তার ইনপুট গ্রহণ করা ও আউটপুট প্রদান করা। এবার যেকোনো ইনপুটের জন্য সঠিক আউটপুটটা পেতে হলে লুক্কায়িত স্তরের মানগুলো কিভাবে পরিবর্তন করতে হবে, সেটা ঠিক করার জন্য একটা প্রক্রিয়া ব্যবহার করা হয়। নিউরাল নেটওয়ার্কটিকে অনেক ধরনের ইনপুট দিয়ে প্রশিক্ষণ দিতে থাকলে সে ধীরে ধীরে লুক্কায়িত স্তরের সঠিক মানগুলো শিখে যায়, যা ব্যবহার করে পরবর্তীতে তাকে নতুন কোনো ইনপুট দিলেও সে তার জন্য সঠিক আউটপুটটি দিতে পারবে। যত বেশি ডেটা দিয়ে প্রশিক্ষণ দেয়া হবে, নিউরাল নেটওয়ার্কটি তত ভালো কাজ করবে। লুক্কায়িত স্তরের সংখ্যা একটা না রেখে অনেকগুলো স্তর ব্যবহার করলে বেশ জটিল ফাংশন শেখা সম্ভব- এ প্রক্রিয়াকে বলা হয় ডীপ লার্নিং (Deep Learning)। ডীপ লার্নিং-এর সাহায্যে ইদানিং কম্পিউটার দ্বারা বেশ কঠিন সব সমস্যার সমাধান হচ্ছে, যা আজ থেকে ১০-১২ বছর আগেও ভাবা যেত না।

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা প্রয়োগের ক্ষেত্রে প্রধানত C/C++, Java, MATLAB, Python, SHRDLU, PROLOG, LISP, CLISP, R ইত্যাদি প্রোগ্রামিং ল্যাংগুয়েজ ব্যবহার করা হয়। কার্যকারিতা ও প্রয়োজনীয়তার ভিত্তিতে ডেভেলপারগণ তাঁদের পছন্দসই প্রোগ্রাম ব্যবহার করে থাকেন।

আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সের সবচেয়ে সফল ক্ষেত্র হিসেবে মেশিন লার্নিং-এর কথা বলা যায়। মেশিন লার্নিং-কে মোটা দাগে তিন ভাগে ভাগ করা যায়: সুপারভাইজড (Supervised) লার্নিং, আনসুপারভাইজড (unsupervised) লার্নিং এবং রিইনফোর্সমেন্ট (reinforcement) লার্নিং। Supervised Learning-এ

মেশিনকে কোনো কিছু শেখানোর জন্য অনেকগুলো উদাহরণ দেয়া হয়, যা থেকে তথ্য আহরণ করে সে শিখে যায় তাকে কি করতে হবে। যেমন ধরো, আমরা কম্পিউটারকে শেখাতে চাই কেমন করে কুকুর আর বিড়াল চিনতে হয়। সেক্ষেত্রে তাকে অনেকগুলো কুকুরের আর বিড়ালের ছবি দেখিয়ে বলে দেয়া হবে কোনগুলো কুকুর আর কোনগুলো বিড়াল। কম্পিউটার তখন কোনো অ্যালগরিদম ব্যবহার করে শিখে ফেলবে কোন কোন বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে এ দু'টো প্রাণীকে আলাদা করা যায়, আর এরপর নতুন কোনো ছবি দেখলে নিজেই শনাক্ত করতে পারবে সেটা কুকুর নাকি বিড়াল। অন্যদিকে

Unsupervised Learning-এ কম্পিউটারকে নির্দিষ্ট করে কিছু বলে দেয়া হয় না, অনেকগুলো ডেটা বিশ্লেষণ করে সে বুঝতে পারবে ডেটাগুলোর পরস্পরের সাথে মিল বা অমিল কতটুকু। যেমন ধরো, কম্পিউটারকে অনেকগুলো প্রাণীর ছবি দিয়ে আমরা যদি কোনোটারই নাম না বলে দেই, তাও সে বুঝতে পারবে যে কুকুর আর নেকড়ে অনেকটা একই রকম, আবার এরা বানর ও শিম্পাঞ্জির থেকে ভিন্ন। Reinforcement learning-এর ক্ষেত্রে কম্পিউটারকে আলাদাভাবে কিছু শেখানো হয় না, নিজের মতোই কাজ করতে দেয়া হয়। কাজ শেষে তাকে শুধু বলা হয় কাজটা কতটুকু ঠিক হয়েছে বা ভুল হয়েছে, যাতে কম্পিউটার এর পরের বার তার আচরণ বা সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করতে পারে। এভাবে প্রথম প্রথম সিদ্ধান্ত নিতে ভুল হবে, কিন্তু অনেকবার কাজটা করতে করতে সে ঠিকই ভুল থেকে শিক্ষা নিয়ে সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে শিখবে। একটু খেয়াল করে দেখো, এই তিন ধরনের মেশিন লার্নিং-ই কিন্তু মানুষ যেভাবে তার পরিবেশ থেকে শেখে, অনেকটা সেভাবেই কাজ করে। আমরা আমাদের জীবদ্দশাতেই আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সের কিছু সফল প্রয়োগ দেখতে পাব, তার একটি হচ্ছে ড্রাইভারবিহীন স্বয়ংক্রিয় গাড়ি। আবহাওয়ার সফল ভবিষ্যৎবাণী আমরা ইতোমধ্যে দেখতে শুরু করেছি। এ ছাড়াও বর্তমান বিশ্বে কম্পিউটার প্রযুক্তিনির্ভর এমন কোনো ক্ষেত্র খুঁজে পাওয়া যাবে না যেখানে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার ব্যবহারিক প্রয়োগ নেই। যেমন চিকিৎসাবিদ্যা, অটোমোবাইল, ফাইন্যান্স, সার্ভেইল্যান্স, সোশাল মিডিয়া, এন্টারটেনমেন্ট, শিক্ষা, স্পেস এক্সপ্লোরেশন, গেমিং, রোবটিক্স, কৃষি, ই-কমার্সসহ স্টক মার্কেটের শেয়ার লেনদেন, আইনি সমস্যার সম্ভাব্য সঠিক সমাধান, বিমান চালনা, যুদ্ধক্ষেত্র পরিচালনা ইত্যাদি ক্ষেত্রে এর ব্যাপক ব্যবহার বর্তমানে পরিলক্ষিত হচ্ছে।

### ১.৩.২ রোবটিক্স (Robotics)

রোবট শব্দটির সাথে আমরা সবাই কম-বেশি পরিচিত, এই শব্দটি দিয়ে আমরা এমন একধরনের যন্ত্রকে বোঝাই যেটি মানুষের কর্মকাণ্ডের অনুরূপ কর্মকাণ্ড করতে পারে। বিজ্ঞান, ইঞ্জিনিয়ারিং এবং প্রযুক্তির সমন্বয়ে গঠিত যে বিষয়টি রোবটের ধারণা, নকশা, উৎপাদন, কার্যক্রম কিংবা ব্যবহার বাস্তবায়ন করতে পারে তাকে রোবটিক্স বলা হয়ে থাকে।

রোবট কথাটি বলা হলে যদিও সাধারণভাবে আমরা মানুষের আকৃতির একটি যন্ত্র কল্পনা করি, কিন্তু প্রকৃত রোবট তার কাজের উপর নির্ভর করে যে কোনো আকারের বা আকৃতির হতে পারে। আজ থেকে এক যুগ আগেও রোবটের মূল ব্যবহার গাড়ির ওয়েন্ডিং কিংবা স্ক্রু লাগানোর মাঝে সীমাবদ্ধ ছিল। প্রযুক্তির উন্নতির সাথে সাথে রোবটের কার্যপরিধিও বেড়ে যেতে শুরু করেছে এবং এমন কোনো কাজ নেই যেখানে রোবট ব্যবহার করা হচ্ছে না।

রোবটের গঠনে তিনটি নির্দিষ্ট বিশেষত্ব রয়েছে। সেগুলো হচ্ছে :

১. একটি রোবট যে নির্দিষ্ট কাজ করার জন্য তৈরি হয়, তার উপর নির্ভর করে একটি বিশেষ যান্ত্রিক গঠন হয়ে থাকে।



চিত্র 1.8 : নিউরাল নেটওয়ার্কের গঠন





চিত্র 1.9 : বাংলাদেশের একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের তৈরি হাটতে সক্ষম একটি রোবট

যে কোনো অনুসন্ধানী কাজে, মাইন ইত্যাদি বিস্ফোরক দ্রব্য নিষ্ক্রিয়করণে, নিউক্লিয়ার শক্তি কেন্দ্রে, খনির অভ্যন্তরের কোনো কাজে, নদী-সমুদ্রের নিচে টানেল নির্মাণ ইত্যাদি কার্যক্রমে রোবট ব্যবহৃত হয়।

২. শিল্প-কারখানার : শিল্পোৎপাদন কাজে, শিল্প-কারখানার ভারী বস্তু নড়াচড়া করানো, প্যাকিং, সংযোজন, পরিবহন ইত্যাদি শ্রমসাধ্য কাজ ছাড়াও কম্পিউটার এইডেড কাজে রোবটিক্স-এর ব্যবহার রয়েছে।

৩. সুস্বাস্থ্যসুস্থ কাজে : মাইক্রোসার্কিটের উৎপাদন পূজ্যানুপূজ্যভাবে পরীক্ষণ কাজ এবং ইলেকট্রনিক আইসি, প্রিন্টেড সার্কিট বোর্ড ইত্যাদির তৈরির জন্য রোবট ব্যবহৃত হয়।

৪. চিকিৎসা ক্ষেত্রে : সার্জারি, জীবাণুমুক্তকরণ, ওষুধ বিতরণ ইত্যাদি কাজে রোবট ব্যবহৃত হয়।

৫. সামরিক ক্ষেত্রে : বিস্ফোরক দ্রব্য শনাক্তকরণ, বোমা নিষ্ক্রিয়করণ, যুদ্ধক্ষেত্রে এবং অন্যান্য সিসিটিরি অপারেশনে রোবট ব্যবহৃত হয়।

৬. শিক্ষা ও বিনোদনে : শারীরিকভাবে অসুস্থ, পলু বা অটিস্টিক শিক্ষার্থীদেরকে বিশেষ শিক্ষা ব্যবস্থায় রোবটের ব্যাপক ব্যবহার রয়েছে। শিশুদের চিত্তবিনোদনের ক্ষেত্রে খেলনা রোবট এবং মিডিয়া আর্টের ক্ষেত্রেও রোবট ব্যবহৃত হয়।

৭. নিরাপত্তা ও পর্যবেক্ষণে : বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ স্থানের নিরাপত্তার জন্য, অন্ধকারে কোনো আগুনের পর্ববেক্ষণ করার জন্য, দুর্ভাগ্যকারী কিংবা বিপজ্জনক আসামীকে ধরা এবং পর্যবেক্ষণে পুলিশকে রোবট সহায়তা দিতে থাকে।

৮. মহাকাশ পর্যবেক্ষণ : মহাকাশে কিংবা অন্য গ্রহ-উপগ্রহ সম্পর্কিত নানাবিধ তথ্যানুসন্ধান ও বৈজ্ঞানিক কার্যক্রম পর্যবেক্ষণের জন্য বা মহাকাশ যান প্রেরণ করার সময় ব্যাপকহারে রোবটের ব্যবহার আছে।

৯. ঘরোয়া কাজে : দৈনন্দিন ঘরোয়া কাজে, গৃহকর্মী হিসেবে নিত্যনৈমিত্তিক কার্যাদি সম্পাদনের জন্য রোবট ব্যবহার করা হয়ে থাকে।

ভবিষ্যতে রোবটের সাথে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা আরো ব্যাপকভাবে সম্পৃক্ত করে রোবটকে অনেক নতুন নতুন কাজে ব্যবহার করা হবে।

২. রোবটের যান্ত্রিক কাজ করার জন্য বিদ্যুৎ ব্যবহারের ব্যবস্থা থাকতে হয়।

৩. রোবটকে কম্পিউটার প্রোগ্রামিং দিয়ে নিয়ন্ত্রণ করা হয়।

রোবট শিল্প এখনো তুলনামূলকভাবে নতুন হলেও এটি সাগরের গভীর থেকে শুরু করে মহাকাশ পর্যন্ত সব জায়গায়, যেখানে মানুষের গকে যাওয়া সম্ভব নয়, সেখানে কাজ করে যাচ্ছে।

#### ব্যবহার (Application)

১. বিপজ্জনক কাজে : মানুষের গকে যে সব কাজ অত্যন্ত বিপজ্জনক এবং ঝুঁকিপূর্ণ, যেমন সমুদ্রের তলদেশে,



### ১.৩.৩ ক্রায়োসার্জারি (Cryosurgery)

ক্রায়োসার্জারি এক ধরনের কাটা ছেঁরাবিহীন চিকিৎসা পদ্ধতি। তথ্য প্রযুক্তির মাধ্যমে অত্যধিক শীতল তাপমাত্রার গ্যাস মানব শরীরে প্রয়োগ করে অপ্রত্যাশিত ও অস্বাভাবিক রোগাক্রান্ত টিস্যু/ত্বক কোষ ধ্বংস করার কৌশল হলো ক্রায়োসার্জারি। মানব শরীরের ত্বক উপরিস্থ বিভিন্ন রোগ যেমন আঁচিল, ফুসকুড়ি, প্রদাহ, ক্ষতিকর কণ্ড ইত্যাদি ক্ষেত্রে এর ব্যাপক ব্যবহার রয়েছে। বিশেষ করে শরীরের অভ্যন্তরস্থ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গসমূহের রোগ যেমন ক্যান্সার, ক্ষত, প্রদাহ ইত্যাদিতে আক্রান্ত কোষগুলোর অবস্থান সিমুলেটেড সফটওয়্যার দ্বারা চিহ্নিত করে সীমানা নির্ধারণ করা হয়। পরবর্তীতে আইসিটি যন্ত্রশক্তি যেমন মাইক্রো ক্যামেরাব্যুক্ত নল প্রবেশ করিয়ে রোগাক্রান্ত কোষ/অংশের ক্ষতস্থান শনাক্ত করে অত্যন্ত সূক্ষ্ম সুচযুক্ত নলের (ক্রায়োপ্রোব) মাধ্যমে ক্রায়োজেনিক বিভিন্ন গ্যাস আক্রান্ত স্থানে প্রয়োগ করা হয়। এখানে বিভিন্ন গ্যাসের তাপমাত্রা ক্ষেত্র বিশেষে -৪১ থেকে -১৯৬ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডে নামিয়ে আনা হয় কলে রোগাক্রান্ত টিস্যু/কোষে রক্ত ও অক্সিজেন সরবরাহ বন্ধ হয়ে যায়। উল্লেখ থাকে কোনো কোনো ক্ষেত্রে এ নিম্ন তাপমাত্রা -২০ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডে নামিয়ে আনা হয়। এতে করে ঐ নিম্নতম তাপমাত্রায় রক্ত ও অক্সিজেন সরবরাহ সম্ভব না হওয়ার দরুন রোগাক্রান্ত টিস্যু/কোষের ক্ষতিসাধন হয়। ক্রায়োসার্জারি চিকিৎসায় রোগের আক্রান্ত স্থান ও রোগের ধরনানুযায়ী এবং নির্দিষ্ট শীতলতায় পৌঁছানোর জন্য তরল নাইট্রোজেন, আর্গন, অক্সিজেন, কার্বনডাই অক্সাইড ইত্যাদি গ্যাস ব্যবহার করা হয়। এই তরল গ্যাসগুলো ক্রায়োজেনিক এজেন্ট নামে পরিচিত।



চিত্র 1.10 : ক্রায়োসার্জারি প্রক্রিয়া এবং ক্রায়োসার্জারিতে ব্যবহৃত প্রোব

রোগীর তথ্য, চিকিৎসার গবেষণার ফলাফল ইত্যাদি সংরক্ষণের জন্য কম্পিউটার ডেটাবেজ সিস্টেম প্রয়োজন হয়।

ক্রায়োসার্জারির অনেক সুবিধা রয়েছে। অন্যান্য চিকিৎসা পদ্ধতির তুলনায় ক্যান্সার ও নিউরোসার্জারি চিকিৎসায় ক্রায়োসার্জারি অনেক সাশ্রয়ী এবং প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে সময় কম লাগে। এ পদ্ধতিতে কোনো জটিল পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া নেই, ব্যথা, রক্তপাত অথবা অগারেশনজনিত কাটা-ছেঁড়ার কোনো জটিলতা নেই। রোগীকে কোনো পূর্ব প্রস্তুতি নিতে হয় না এবং অনেকক্ষেত্রে সার্জারি শেষে রোগীকে হাসপাতালেও থাকতে হয় না।

তবে আক্রান্ত কোষের সঠিক অবস্থান নির্ণয়ে ব্যর্থ হলে ক্রায়োসার্জারি ব্যবহারে জীবাণু শরীরের অন্যান্য অংশে ছড়িয়ে পড়ার আশঙ্কা থাকে। এর পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া হিসেবে লিভার ও ফুসকুসের স্বাভাবিক গঠন বিনষ্ট কিংবা মায়নিক সমস্যার উদ্ভব হতে পারে।

### ১.৩.৪ মহাকাশ অভিযান (Space Exploration)

মহাকাশচারীসহ কিংবা মহাকাশচারী ছাড়াই কোনো মহাকাশযান যখন পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ শক্তির বীধন কাটিয়ে পৃথিবীপৃষ্ঠ থেকে কসপকে একশত কিলোমিটার উপরে বায়ুমণ্ডলের বাইরে যায় আমরা সেটাকে কর্কা-৩, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি, একাদশ-মাদন প্রেপি

ক্রায়োসার্জারিতে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ভূমিকা অনেক বেশি, যেমন আক্রান্ত কোষ বা টিস্যুর অবস্থান নির্ণয়ে এবং সমস্ত কার্যাবলী পর্যবেক্ষণের কাজে সারাক্ষণ কম্পিউটার নিয়ন্ত্রিত ব্যবস্থা ব্যবহৃত হয়। সেজন্য ক্রায়োসার্জারিতে চিকিৎসা ব্যবস্থায় অভিজ্ঞ করে তুলতে ডাক্তারদের প্রশিক্ষণে ভার্চুয়াল রিয়েলিটি ব্যবহার করা হয়।

মহাকাশ অভিযান বলে থাকি। মহাকাশ অভিযানের কয়েকটি মাইল কলকের মাঝে উল্লেখযোগ্যগুলো হলো, ১৯৫৭ সালের ৪ অক্টোবরে মহাকাশে প্রথম উপগ্রহ স্পুটনিক উৎক্ষেপণ, ১৯৬১ সালের ২ এপ্রিল প্রথম মানুষ, যুরি গ্যাগারিনের মহাকাশ অভিযান, ২০ জুলাই ১৯৬৯ প্রথম মানুষের চাঁদে অবতরণ, ২ ডিসেম্বর ১৯৭১ প্রথম মঙ্গল গ্রহে মার্স-৩-এর অবতরণ এবং ১২ এপ্রিল ১৯৮১ প্রথম স্পেস শাটল উৎক্ষেপণ। এর ভেতর চাঁদে অবতরণ এবং স্পেস শাটলের উৎক্ষেপণ ছিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের, অন্যগুলো ছিল তৎকালীন সোভিয়েত ইউনিয়নের।

মহাকাশ অভিযান করার জন্য একটি মহাকাশযানকে ঘণ্টায় প্রায় তিরিশ হাজার মাইল গতিবেগ অর্জন করতে হয় যেটি শব্দের গতিবেগ থেকে প্রায় আটগুণ বেশি। এর জন্য একাধিক রকেটকে নির্ভুলভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে হয়। মহাকাশচারীসহ একটি মহাকাশযানকে আবার পৃথিবীতে ফিরিয়ে আনতে হলে এই প্রচলিত গতিবেগে বায়ুমন্ডলে প্রবেশ করার সময় বাতাসের ঘর্ষণে সৃষ্ট তাপকে বিকিরণ করে তার গতিবেগ আবার সহনশীল পর্যায়ে ফিরিয়ে আনতে হয়। এই পুরো প্রক্রিয়াটি সফলভাবে সম্পন্ন করার জন্য বিজ্ঞানীদের দীর্ঘকাল গবেষণা করতে হয়েছে। মহাকাশযানের গতিপথ নির্ণয়, স্বয়ংক্রিয় নির্ভুলভাবে পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণ এবং সর্বক্ষণ পৃথিবীর সাথে যোগাযোগ রক্ষা করার জন্য তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির উপর পুরোপুরি নির্ভর করতে হয়।



চিত্র 1.11: পৃথিবীকে ঘিরে ঘূর্ণায়মান মহাকাশ স্টেশন

মহাকাশ প্রযুক্তির বিকাশ হওয়ার পর অসংখ্য স্যাটেলাইট বা কৃত্রিম উপগ্রহ মহাকাশে উৎক্ষেপণ করা হয়েছে। এর মাঝে উল্লেখযোগ্য এক ধরনের স্যাটেলাইটকে বলে জিওস্টেশনারি স্যাটেলাইট। এই স্যাটেলাইটগুলো পৃথিবী পৃষ্ঠ থেকে প্রায় ৩৬০০০ কিলোমিটার উপরে পৃথিবীর ঘূর্ণনের সাথে মিল রেখে ঘব্ব একই গতিতে পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করে, তাই জিওস্টেশনারি স্যাটেলাইটকে পৃথিবী থেকে আকাশে একজায়গায় স্থির হয়ে আছে বলে মনে হয়। টেলিকমিউনিকেশনে ব্যবহার করার জন্য এটি প্রথম আবশ্যকীয় শর্ত। বাংলাদেশ বর্ষবন্ধু-১ নামে যে স্যাটেলাইটটি মহাকাশে স্থাপন করে বিশ্বের ৫৭তম দেশ হিসেবে নিজস্ব স্যাটেলাইটের মালিকানা অর্জন করেছে, সেটি একটি জিওস্টেশনারি স্যাটেলাইট।

### ব্যবহার (Application)

বর্তমান বিশ্বে স্যাটেলাইট প্রযুক্তি অত্যন্ত প্রয়োজনীয় একটি প্রযুক্তি। শুনে অবিশ্বাস্য মনে হতে পারে, কিন্তু আমরা প্রতিদিনের আমাদের দৈনন্দিন জীবনে সরাসরি স্যাটেলাইট প্রযুক্তি ব্যবহার করি। আমাদের স্মার্টফোনে যে জিপিএস (GPS: Global Positioning System) আছে, সেগুলো অসংখ্য স্যাটেলাইটের সিগন্যাল ব্যবহার করে কাজ করে। যখন আমরা টেলিভিশনে কোনো অনুষ্ঠান দেখি সেগুলো অনেক সময় স্যাটেলাইট থেকে সম্প্রচার করা হয়। আমরা যখন দূর দেশে কথা বলি অনেক সময়েই সেই কথাগুলো স্যাটেলাইটের ভেতর দিয়ে সেখানে যায়। যখন সমুদ্রে নিয়ন্ত্রণ ঘূর্ণিঝড়ে কুশান্তরিত হয়, আবহাওয়া



স্যাটেলাইট তার নির্মূল হবি তুলে আনাদের সতর্ক করে দেয়। মহাকাশ পবেষণায় স্যাটেলাইট অনেক বড় ভূমিকা রেখেছে, হাবল টেলিস্কোপে তোলা গ্রহ-নক্ষত্রের ছবি বিজ্ঞানের জগতে নতুন দিগন্তের সৃষ্টি করেছে।

তবে মহাকাশ অভিযানে প্রযুক্তিগত সমস্যা ছাড়াও মনুষ্য সৃষ্ট সমস্যাও আছে, যেমন মহাকাশে বিভিন্ন উচ্চতায় অসংখ্য পরিত্যক্ত এবং অকেজো মহাকাশযান কিংবা তাদের ভগ্নাংশ অচিহ্নীয় পতিবেগে পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করে যাচ্ছে। সেগুলোর সঙ্গে অন্য মহাকাশযানের সংঘর্ষের আশঙ্কা এখন একটি বাস্তব সমস্যা। মহাকাশ অভিযান যে এখন শুধু মানুষের কল্যাণের জন্য করা হয় সেটিও সত্যি নয়। অনেক দেশই নানা ধরনের শৌণন সামরিক তথ্য সংগ্রহের জন্য স্যাটেলাইটগুলো ব্যবহার করে। শুধু তাই নয়, যুদ্ধবাজ দেশগুলো মহাকাশভিত্তিক সামরিক বাহিনী গড়ে তোলার ঘোষণা দিয়েছে, যেটি সমস্ত পৃথিবীকে একটি বড় বিপদের ঝুঁকিতে ফেলে দিয়েছে।

### বলবদ্ধ-১ স্যাটেলাইট

বলবদ্ধ-১ স্যাটেলাইট থেকে নিম্নলিখিত সুযোগ-সুবিধা পাওয়া যাবে:

১. ডিশ সার্ভিস চালু হওয়ার মাধ্যমে টিভি চ্যানেলগুলোকে আর বিদেশি স্যাটেলাইট ভাড়া করতে হবে না।
২. এটি শুধু বাংলাদেশ নয়, বাংলাদেশের কাছাকাছি অন্য অনেক দেশকে কভার করবে, কাজেই সেই দেশগুলোও বলবদ্ধ-১ স্যাটেলাইট থেকে প্রয়োজনীয় সেবা কিনতে পারবে।
৩. দেশের ইন্টারনেট সুবিধাবঞ্চিত এলাকা যেমন— দুর্গম পার্বত্য ও হাওড় অঞ্চলে ইন্টারনেটের মাধ্যমে অনলাইন ব্যাংকিং, টেলিমেডিসিন, দূরনিয়ন্ত্রিত শিক্ষা কার্যক্রমসহ নানাবিধ সেবা গ্রহণে সক্ষম হবেন।
৪. প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময় মোবাইল কোন নেটওয়ার্কে বিপর্যয় ঘটলে দ্রুততম সময়ের মধ্যে এই স্যাটেলাইটের মাধ্যমে সার্বিক যোগাযোগ চালু রাখা সম্ভব হবে।
৫. এছাড়াও এই স্যাটেলাইটে স্থাপিত অত্যাধুনিক ক্যামেরার মতো সূক্ষ্ম প্রযুক্তি ব্যবহার করে দেশের অনেক মূল্যবান তথ্য উদ্ধার সংগ্রহ করতে পারবে।

### ১.৩.৫ আইসিটিনির্ভর উৎপাদন ব্যবস্থা (ICT Dependent Production)

ব্যবহারকারী বা তৈরিকারীর ব্যবহার্য অত্যাধুনিক পণ্য ও পরিষেবা তৈরি বা সরবরাহের পদ্ধতিকে বলে উৎপাদন। এই প্রক্রিয়া সৃজনশীলতা, পবেষণা, জ্ঞান, মেধা ও মনন ইত্যাদির সমন্বিত ব্যবহার বা কর্মের দ্বারা দৃশ্যমান হয়। একদিকে মানুষের প্রয়োজন ও পছন্দের বৈচিত্র্য অন্যদিকে বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে মানুষকে নতুন নতুন পণ্যের প্রতি প্রলুব্ধ করার কারণে মানুষের নানা রকম চাহিদার সৃষ্টি হয়। সেই চাহিদা মিটাতে প্রতিনিয়ত পণ্যের নতুন নতুন মডেল বাজারে আসছে। চাহিদা মোতাবেক পণ্যের বৈচিত্র্য ও গুণগতমান নির্ধারণের জন্য পরিকল্পনা, পরিকল্পনা, বিপণন, নকশা, উন্নয়ন ইত্যাদির জন্য তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির উপর নির্ভর করতে হয়। উৎপাদন সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন যন্ত্রপাতি ব্যবহারের ক্ষেত্রে

Program Logic Controller (PLC) ব্যবহার করে উৎপাদনশীলতাও বৃদ্ধি পাচ্ছে। আজকাল হাতের স্পর্শ ছাড়াই কম্পিউটার নিয়ন্ত্রিত পদ্ধতিতে কলকারখানায় পণ্যোৎপাদন চলছে। যার দরুন সময়ের অপচয় রোধসহ কীচামাল নষ্ট হওয়ার আশঙ্কা কমে গেছে।



চিত্র 1.12 : বাংলাদেশে তৈরিকারীর কারখানার স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতিতে উৎপাদন

তাছাড়া, আধুনিক উৎপাদন ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে যে কোনো ধরনের যন্ত্র, পণ্যদ্রব্য ডিজাইনিং, ড্রাফটিং, সিমুলেশন করার জন্য বিশেষায়িত সফটওয়্যার, যেমন— Computer Aided Design (CAD) ইত্যাদির মাধ্যমে নিখুঁতভাবে নকশা প্রণয়ন করা হয়। জটিল ডাইস (Dice) কম্পিউটার নিয়ন্ত্রিত যন্ত্রের সাহায্যে নিখুঁতভাবে কাটা যায়। বিভিন্ন রাসায়নিক কারখানা কিংবা ওষুধ শিল্পে কম্পিউটারের সাহায্যে কৌচামালের পরিমাণ, কিংবা চাপ ও তাপ নিখুঁতভাবে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হয়। উৎপাদন ব্যবস্থাপনার সাথে সম্পৃক্ত কর্মীবাহিনীর যাবতীয় তথ্যাদি যেমন— দক্ষতা, শ্রমঘণ্টা, পারিশ্রমিকসহ ব্যক্তিগত তথ্যাদি এবং পণ্য সংক্রান্ত সার্বিক তথ্য নির্ধারিত সফটওয়্যারে সংরক্ষণ করে পরিপূর্ণভাবে ব্যবহার করা সম্ভব হয়। একটি কারখানাকে পরিপূর্ণভাবে স্বয়ংক্রিয় করে সেটিকে চক্কি ঘণ্টা কর্মক্ষম রাখা সম্ভব।

কৃষিক্ষেত্রে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ব্যবহার দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। শস্য উৎপাদন, মৎস্য চাষ, প্রাণিসম্পদ, বনজ সম্পদ, মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন-পর্যবেক্ষণ-রক্ষণাবেক্ষণ কাজে উন্নত প্রযুক্তির ব্যবহার এবং সচেতনতা সৃষ্টির ক্ষেত্রে ইলেকট্রনিক মিডিয়া, প্রিন্ট মিডিয়া কাজ করে যাচ্ছে। দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চল ও তৃণমূল পর্যায়ে কৃষক ও প্রান্তিক চাষীগণকে খুব সহজ, সরল ও আকর্ষণীয়ভাবে কৃষি সংক্রান্ত যাবতীয় বিষয় অবহিতকরণ ও তথ্য সরবরাহের দ্বারা কৃষিতে বৈপ্লবিক পরিবর্তন সূচিত হয়েছে। ঋতুভিত্তিক চাষাবাদ, বীজের ধরন, মাটির গুণাগুণ পরীক্ষণ, সার প্রয়োগের পরিমাপ, রোগ-বালাই প্রতিরোধ, কৃষিপণ্যের বাজারমূল্য ইত্যাদি সম্পর্কে সবধরনের তথ্য এর মাধ্যমে জানতে পারবেন। তাছাড়া কৃষি গবেষণাগারে জিন প্রযুক্তি ব্যবহার করে আবহাওয়া ও পরিবেশ উপযোগী নতুন নতুন খাদ্যশস্য ব্যাপক হারে উৎপাদনের বিষয়ের তাত্ত্বিক কার্যক্রম কিন্তু আইসিটি ব্যবহারেই সম্ভব হচ্ছে। আমাদের দেশে কৃষি তথ্য সার্ভিস সংক্রান্ত সরকারি এবং বেসরকারি ওয়েবসাইট-এর মাধ্যমেও কৃষি সম্পর্কিত যাবতীয় তথ্যসেবা পাওয়া যাবে।

সুগার মিলগুলোতে ই-পুর্জি চালু হওয়ার সুবাদে কৃষকগণ মোবাইল ফোন কিংবা অনলাইনের মাধ্যমে তীর আখ সরবরাহের তথ্যাদি দ্রুত পেতে পারেন। অন্যদিকে, প্রাণিসম্পদ উন্নয়নে তথ্য প্রযুক্তির নানাভাবে প্রয়োগ ঘটছে। যার মাধ্যমে প্রাণিসম্পদ সহজে শনাক্তকরণ, মালিকের নাম, লিঙ্গ, জন্ম তারিখ ইত্যাদি তথ্য সহজেই বের করা সম্ভব হচ্ছে।

### ১.৩.৬ প্রতিরক্ষা (Defence)

প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা যে কোনো দেশের সার্বভৌমত্ব ও জনগণের নিরাপত্তার বিষয়টি নিশ্চিত করে থাকে। সন্ত্রাস, সাইবার ক্রাইম প্রতিরোধের বিষয়টিও এর অন্তর্ভুক্ত।

বিশ্বের প্রতিটি দেশের প্রতিরক্ষার সাথেই প্রতিরক্ষা শিল্প খুবই ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কযুক্ত। এটি একদিকে যুদ্ধাস্ত্র উৎপাদন করে প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাকে স্বয়ংসম্পূর্ণ করে এবং অন্যদিকে অর্থনীতিতেও উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে থাকে। এই শিল্পের সাথে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি যুক্ত হওয়ায় বিশ্বের বিভিন্ন দেশের প্রতিরক্ষা শিল্পে ভিন্নমাত্রা পেয়েছে। পৃথিবীর অনেক দেশ সরাসরি যুদ্ধাস্ত্র উৎপাদন করতে না পারলেও তাদের মানব সম্পদ ব্যবহার করে প্রতিরক্ষার সাথে সম্পর্কিত সফটওয়্যার প্রস্তুত এবং বিপণন করে দেশের অর্থনীতিতেও বড় ভূমিকা পালন করেছে।

প্রতিরক্ষা এবং আইসিটি একে অপরের পরিপূরক হিসেবে কাজ করেছে। যেমন— একসময় বোমার কোনো নিজস্ব বুদ্ধিমত্তা ছিল না, তাকে যেখানে নিক্ষেপ করা হতো সেটি সেখানে আঘাত করত। এখন আইসিটির সহায়তায় স্মার্ট বোমা তৈরি করা সম্ভব হয়েছে, যেটি নির্দেশ শুনে নির্দিষ্ট জায়গায় গিয়ে আঘাত করতে পারে। সাম্প্রতিক কালে মনুষ্যবিহীন এয়ারক্রাফট (Unmanned Aerial Vehicle-UVA) বা ড্রোন (Drone) ব্যবহার করে যুদ্ধের পরিস্থিতিই পাণ্টে দেওয়া সম্ভব হচ্ছে। আকাশ থেকে মহাকাশকেন্দ্রিক এবং হার্ডওয়্যার থেকে সফটওয়্যার বেজড যুদ্ধ এখনকার যুদ্ধের নিত্যদিনের চিত্র। আধুনিক যুদ্ধে স্যাটেলাইট এবং



ইন্টারনেটের প্রভাব অপরিসীম। প্রতিরক্ষা শিল্পে এসবের লক্ষ্যীয় প্রভাবগুলো নিম্নরূপ :

১. সেনাবাহিনীকে প্রশিক্ষণ দেওয়ার কাজে সিমুলেশন এবং ভার্চুয়াল রিয়েলিটি পরিবেশ তৈরি করে ব্যাপকভাবে তথ্য প্রযুক্তিকে ব্যবহার করা হয়। এটি নিরাপদ, অর্থ সাশ্রয়ী এবং ২৪ ঘণ্টা চালু রাখা সম্ভব।

২. মানুষকেন্দ্রিক যুদ্ধক্ষেত্র ব্যবস্থাপনার পরিবর্তে আধুনিক যুদ্ধে নেটওয়ার্কভিত্তিক যুদ্ধ পরিচালনা করা হয়। এক্ষেত্রে কমান্ডার তার অফিসে অবস্থান করে যুদ্ধের সার্বিক অবস্থা পর্যবেক্ষণ করে যুদ্ধ পরিচালনায় তাৎক্ষণিকভাবে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে পারেন।



চিত্র 1.13 : বাংলাদেশ সেনাবাহিনী আভিসংকেতের বিশদে যুদ্ধবিভক্ত সেনার নিরাপত্তার দায়িত্ব পালনরত

৩. স্যাটেলাইট যোগাযোগ ব্যবস্থার দ্বারা দূর থেকে যুদ্ধক্ষেত্রের পরিস্থিতি সরাসরি সম্প্রচার, পর্যবেক্ষণ ও কমান্ডিং করা সম্ভব হয়।

৪. শত্রুবাহিনীকে পর্যবেক্ষণ করার জন্য তাদের কমান্ড সেন্টারের যোগাযোগ ব্যবস্থা ইলেক্ট্রনিক জ্যামিং করে অচল করে দিতে পারে।

৫. মিসাইল বা ফেপলান্ড্র তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহার করে অত্যন্ত কার্যকর ও নিখুঁতভাবে লক্ষ্যবস্তুতে আঘাত হানতে পারে।

৬. অত্যন্ত গোপনে শত্রুপক্ষের শিবিরে আঘাত হানার জন্য ড্রোন ব্যবহার করা যায়।

৭. মিসাইল, রকেট বা ড্রোন আক্রমণ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য পালটা প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তোলার কাজে তথ্য প্রযুক্তিকে ব্যাপকভাবে ব্যবহার করা হয়।

বর্তমানে সেনা, নৌ ও বিমান বাহিনী একত্রে বাংলাদেশ আর্মড ফোর্সেস বা বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনী নামে পরিচিত। এই বাহিনীর উপর আমাদের দেশের প্রতিরক্ষার দায়িত্ব ন্যস্ত আছে। আমাদের সশস্ত্র বাহিনীকে আধুনিকায়ন করে তথ্য প্রযুক্তিতে দক্ষ করার পরিকল্পনা করা হয়েছে। সশস্ত্র বাহিনীকে আধুনিক প্রযুক্তিতে অগ্রসংস্কৃষ্ট করার জন্য মিলিটারি ইন্সটিটিউট অফ সায়েন্স এন্ড টেকনোলজি (MIST) গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে।

এখানে উল্লেখ্য যে প্রতিরক্ষা বাহিনীর নানা ধরনের গবেষণার কারণে অনেক নতুন নতুন প্রযুক্তি গড়ে উঠেছে এবং পৃথিবীর সাধারণ মানুষ লাভবান হয়েছে। ইন্টারনেট এবং জিপিএস সেরকম দুইটি উদাহরণ। অন্যদিকে এটাও সত্যি যে পৃথিবীতে যুদ্ধাঙ্গের একটি বিশাল বাণিজ্য ধাক্কার কারণে পৃথিবীর বিশাল সম্পদ অলচয় করে প্রতিনিয়ত নতুন যুদ্ধাঙ্গ তৈরি হয়। সেই অল্প প্রকৃত যুদ্ধাবস্থায় পরীক্ষা করার জন্য নির্দিষ্ট সময় পরে পরে পৃথিবীর নানা প্রান্তে যুদ্ধ লাগিয়ে রাখার দুর্ভাগ্যজনক উদাহরণও রয়েছে।

### ১.৩.৭ বায়োমেট্রিক (Biometric)

মানুষের দৈহিক গঠন বা আচরণগত বৈশিষ্ট্য পরিমাপের ভিত্তিতে কোনো ব্যক্তিকে অস্বীকৃতভাবে শনাক্ত করার জন্য ব্যবহৃত প্রযুক্তিকে বায়োমেট্রিক বলে। একজন মানুষের সাথে অন্য মানুষের আচরণ বা গাঠনিক বৈশিষ্ট্য কখনোই একরকম হবে না। বৈশিষ্ট্যের ভিন্নতায় বায়োমেট্রিকের প্রকারভেদ দুইরকম :



চিত্র 1.14: আঙুলের রেখা শনাক্তকরণ যন্ত্রের ব্যবহার

### (ক) শরীরবৃত্তীয় (Physiological)

#### বায়োমেট্রিক পদ্ধতি

**আঙুলের ছাপ শনাক্তকরণ (Finger print) :** এ পৃথিবীতে প্রকৃতিগতভাবে প্রতিটি মানুষের আঙুলের ছাপ ভিন্ন অর্থাৎ একজনের সাথে অন্য আরেকজনের আঙুলের ছাপের মিল নেই। একজনের টিপসই কখনোই অন্যজনের সাথে খাপ খাবে না। ফিংগার প্রিন্ট রিডারে কারো আঙুলের ছাপ দেয়ার পর ছাপটির ছবি কম্পিউটার ডেটাবেজে সংরক্ষিত হয়ে যায়। ফিংগার প্রিন্ট

মেশিনটি আঙুলের রেখার বিন্যাস, ডকের টিস্যু এবং ডকের নিচের রক্ত সঞ্চালনের উপর ভিত্তি করে ইলেকট্রোম্যাগনেটিক পদ্ধতিতে আঙুলের ছাপচিত্র তৈরি করে।

**হাতের রেখা শনাক্তকরণ (Hand geometry) :** এ পদ্ধতিতে হাতের আকার, পুরুত্ব, হাতের রেখার বিন্যাস ও আঙুলের দৈর্ঘ্য বিশ্লেষণ করে নিরাপত্তা নিশ্চিত করা হয়। তবে কায়িক পরিশ্রম করে এমন মানুষ, বিশেষ করে শ্রমিকদের ক্ষেত্রে এ পদ্ধতি খুব বেশি কার্যকর নয়। তাছাড়া হাতে কিছু লেগে থাকলেও এ পদ্ধতির কার্যকারিতা সেভাবে পরিলক্ষিত হয় না।

**আইরিশ শনাক্তকরণ (Irish scanning) :** এ পদ্ধতিতে চোখের মণির চারপাশে বেষ্টিত রঙিন বলয় বা আইরিশ বিশ্লেষণ করে শনাক্তকরণের কাজ সম্পন্ন করা হয়। শনাক্তকরণের জন্য সময়ও তুলনামূলকভাবে কম লাগে এবং সুস্বচ্ছতাও গ্রহণযোগ্য মাত্রায় হয়ে থাকে। তবে কন্টাক্ট লেন্স পরা থাকলে এ পদ্ধতি সবসময় কার্যকরী নাও হতে পারে।

**মুখমণ্ডলের অবয়ব শনাক্তকরণ (Face recognition) :** এই পদ্ধতিতে পুরো মুখমণ্ডলের ছবি ভুলে শনাক্ত করা হয়। আগে থেকে রক্ষিত স্যাম্পল মানের সাথে যার মুখমণ্ডলের আকৃতি তুলনা করা হবে তার ছবি ক্যামেরার মাধ্যমে ধারণ করে সেটি তুলনা করা হয়।

**ডিএনএ পরীক্ষণ (DNA test) :** ডিএনএ (DNA: Deoxyribo Nucleic Acid) টেস্টের মাধ্যমে যে কোনো ব্যক্তিকে অত্যন্ত নিখুঁত ও প্রমাণীয়ভাবে শনাক্ত করা যায়। মানব শরীরের যে কোনো উপাদান যেমন— রক্ত, চুল, আঙুলের নখ, মুখের লাল হতে ডিএনএ'র নমুনা সংগ্রহ করা হয়। এরপর এগুলোর গঠন-প্রকৃতি শনাক্তের দ্বারা ম্যাগ বা ব্লু-প্রিন্ট বায়োলাজিক্যাল ডেটাবেজে সংরক্ষণ করা হয়। পরবর্তীকালে নমুনা নিয়ে পূর্ববর্তী ডেটার সাথে মিলিয়ে কোনো ব্যক্তিকে অদ্বিতীয়ভাবে শনাক্ত করা যায়।

### (খ) আচরণগত (Behavioral) বায়োমেট্রিক পদ্ধতি

**কিবোর্ডে টাইপিং গতি যাচাইকরণ (Typing keystroke verification) :** কিবোর্ড কিংবা এ জাতীয় কোনো ইনপুট ডিভাইসে তার গোপনীয় কোড কত দ্রুত টাইপ করে দিতে পারে তার সময় পূর্বের সময়ের সাথে মিলিয়ে কোনো ব্যক্তিকে শনাক্তকরণের কাজ সম্পন্ন করা হয়।

**হাতে করা স্বাক্ষর যাচাইকরণ (Signature verification) :** এটি একটি বহুল ব্যবহৃত ও দীর্ঘদিনের প্রচলিত পদ্ধতি। এ পদ্ধতিতে কোনো ব্যক্তিকে শনাক্তকরণের ক্ষেত্রে স্বাক্ষরের আকার, ধরন, লেখার গতি, সময়, লেখার মাধ্যমের (যেমন— কলম, পেনসিল ইত্যাদি) চাপকে যাচাই করে শনাক্তকরণ করা হয়।

**কণ্ঠস্বর যাচাইকরণ (Voice recognition) :** এই পদ্ধতিতে ব্যবহারকারীর কণ্ঠস্বরকে মাইক্রোফোনের মাধ্যমে ধারণপূর্বক কম্পিউটার প্রোগ্রামিং-এর সাহায্যে ইলেকট্রিক সিগন্যালে রূপান্তর করে ডেটাবেজে সংরক্ষণ করা হয়। পরবর্তীকালে ভয়েস রেকর্ডারের মাধ্যমে ব্যবহারকারীর কণ্ঠস্বর রেকর্ড করা হয় এবং পূর্বের ধারণকৃত কণ্ঠস্বরের সাথে তুলনা করে শনাক্তকরণের কাজ সম্পন্ন করা হয়। এ পদ্ধতিতে ব্যক্তির সর্দি, কাশি হলে শনাক্তকরণে বিঘ্নের সৃষ্টি হয়।

### বায়োমেট্রিক প্রযুক্তি ব্যবহারের ক্ষেত্রসমূহ

মৃতদেহ শনাক্তকরণ, অপরাধী শনাক্তকরণ, পিতৃ বা মাতৃ শনাক্তকরণ, জাতীয় পরিচয়পত্র, বায়োমেট্রিক পাসপোর্ট, ডাইভিং লাইসেন্স, ভোটার নিবন্ধন, এটিএম ও অনলাইন ব্যাংকিং, প্রবেশ নিয়ন্ত্রণ ও উপস্থিতি নির্ণয়, কম্পিউটার বা মোবাইল ফোন লগইন, ই-কমার্স ও স্মার্ট কার্ড ইত্যাদিতে বায়োমেট্রিক প্রযুক্তির ব্যবহার হয়ে থাকে।

### ১.৩.৮ বায়োইনফরমেটিক্স (Bioinformatics)

বায়োইনফরমেটিক্স জীববিজ্ঞান, কম্পিউটার সায়েন্স, ইনফরমেশন ইঞ্জিনিয়ারিং, গণিত এবং পরিসংখ্যানের সমন্বয়ে গঠিত একটি বিষয়। মূলত এই বিষয়টির জন্ম হয়েছে জীববিজ্ঞানের বিশাল পরিমাণ ডেটা সংগ্রহ, সংরক্ষণ এবং সঠিকভাবে প্রক্রিয়া করে সেগুলো ব্যাখ্যা করার জন্য।

বায়োইনফরমেটিক্সের প্রথম বড় সাফল্য এসেছিল যখন ১৩ বছরের দীর্ঘ প্রচেষ্টার পর মানব জিনোম প্রথমবার সিকোয়েন্স করা হয়েছিল এবং সেই তথ্য অনলাইনে প্রকাশিত হয়েছিল যেন সারা পৃথিবীর বিজ্ঞানীরা সেটি পেতে পারে। এখন প্রযুক্তির উন্নয়নের কারণে কয়েক ঘণ্টার ভেতর পুরো মানব জিনোম সিকোয়েন্স করা সম্ভব। বায়োইনফরমেটিক্সের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র হচ্ছে ক্যান্সারের উপর গবেষণা। ভবিষ্যতে প্রত্যেকটা মানুষের জন্য আলাদা আলাদাভাবে তার নিজস্ব ওষুধ ব্যবহৃত হবে, সেটিও সম্ভব হবে বায়োইনফরমেটিক্সের গবেষণার ফলে। প্রোটিনের গঠন বহুদিন থেকে বিজ্ঞানীদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। বায়োইনফরমেটিক্স এই ব্যাপারেও মূল গবেষণায় বড় ভূমিকা পালন করছে। বিজ্ঞানে একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে বিবর্তন। এই বিবর্তনের রহস্য উন্মোচনে বায়োইনফরমেটিক্স অনেক বড় একটি ভূমিকা পালন করছে।

সাধারণত নিচের চারটি ভিন্ন ভিন্ন শাখার উপাদান ও কৌশলের সমন্বয়ে বায়োইনফরমেটিক্স পদ্ধতি কাজ করে থাকে :

১. **আণবিক জীববিদ্যা ও মেডিসিন :** ডেটা উৎস বিশ্লেষণের কাজ করে।
২. **ডেটাবেজ :** নিরাপদ ডেটা সংরক্ষণ ও ডেটা রিট্রিভ (Retrive) করা।
৩. **প্রোগ্রাম :** উপাত্ত বিশ্লেষণ অ্যালগরিদম যার মাধ্যমে বায়োইনফরমেটিক্স কঠোরভাবে সুনির্দিষ্ট করা হয়।
৪. **গণিত ও পরিসংখ্যান :** এর সাহায্যে সম্ভাব্যতা যাচাই করা হয়।

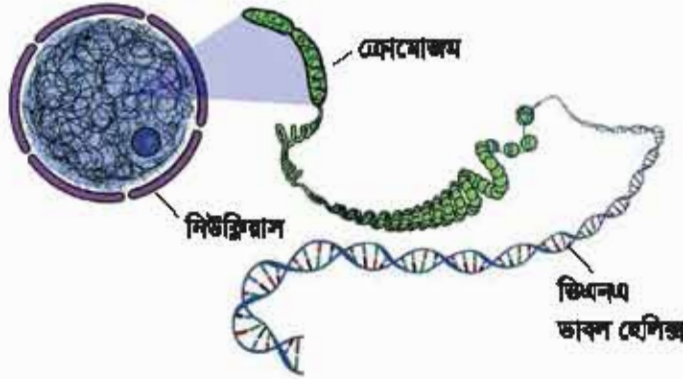
### বায়োইনফরমেটিক্সের ব্যবহার

মূলত জৈবিক পদ্ধতি বিশ্লেষণ সম্পর্কে সম্যক এবং সঠিক ধারণা অর্জন করার ক্ষেত্রে বায়োইনফরমেটিক্স ব্যবহৃত হয়। আর এই জৈবিক তথ্য হিসাব-নিকাশ এবং এ সম্পর্কিত যাবতীয় সমস্যার সমাধানে কম্পিউটার প্রযুক্তির ব্যবহারও অপরিহার্য। তবে জিনোম সিকোয়েন্স, প্রোটিন সিকোয়েন্স ইত্যাদি গঠন উপাদানের ইলেকট্রনিক ডেটাবেজ গঠনে কম্পিউটার প্রযুক্তি বিশেষভাবে ব্যবহৃত হয়। এ ছাড়াও মলিকুলার মেডিসিন, জিনথেরাপি, ওষুধ তৈরিতে, বর্জ্য পরিষ্কারকরণে, জলবায়ু পরিবর্তন গবেষণায়, বিকল্প শক্তির উৎস সন্ধান, জীবাণু অস্ত্র তৈরিতে, ডিএনএ ম্যাপিং ও অ্যানালাইসিস, জিন ফাইন্ডিং, প্রোটিনের মিথস্ক্রিয়া পর্যবেক্ষণে বায়োইনফরমেটিক্স ব্যবহৃত হয়।



### ১.৩.৯ জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং (Genetic Engineering)

আমরা জানি, প্রতিটি জীবদেহ অসংখ্য ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র কোষ দিয়ে গঠিত। প্রত্যেকটি কোষের মাঝে থাকে



চিত্র 1.15 : নিউক্লিয়াসের ভেতর ক্রোমোসোম এবং ডিএনএ ডাবল হেলিক্সের অবস্থান

ক্রোমোসোম (Chromosome), যেগুলো তৈরি হয় ডিএনএ (DNA: Deoxyribo Nucleic Acid) ডাবল হেলিক্স দিয়ে। এই ডিএনএ'র ভেতর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশ সেই প্রাণীর জীবনের বৈশিষ্ট্যকে বহন করে এবং সেগুলো জিন (Gene) হিসেবে পরিচিত। একটি ক্রোমোসোমে অসংখ্য জিন থাকতে পারে, মানবদেহে ২০ হাজার থেকে ৩০ হাজার জিন রয়েছে। এ ধরনের এক সেট জিনকে জিনোম বলা হয়।

জিনোম হলো জীবের বৈশিষ্ট্যের নকশা বা বিন্যাস। জিনোম সিকোয়েন্স দিয়ে বোঝায় কোষের সম্পূর্ণ ডিএনএ বিন্যাসের ক্রম; জিনোম যত দীর্ঘ হবে, তার ধারণ করা তথ্যও তত বেশি হবে। জিনোমের উপর নির্ভর করে ঐ প্রাণী বা উদ্ভিদের বৈশিষ্ট্য কীরূপ হবে।

যেহেতু একটি জিন হচ্ছে একটি প্রাণীর বৈশিষ্ট্যের বাহক, তাই কোনো প্রাণীর জিনোমের কোনো একটি জিনকে পরিবর্তন করে সেই প্রাণীর কোনো একটি বৈশিষ্ট্য পরিবর্তন করা সম্ভব। যেহেতু জিনগুলো আসলে ডিএনএ'র একটি অংশ, তাই একটা জিনকে পরিবর্তন করতে হলে ল্যাবরেটরিতে ডিএনএ'র সেই অংশটুকু কেটে আলাদা করে অন্য কোনো প্রাণী বা ব্যাকটেরিয়া থেকে আরেকটি জিন কেটে এনে সেখানে লাগিয়ে দিতে হয়।

গবেষণার মাধ্যমে যখন একটি জিন পরিবর্তন করে সেখানে অন্য জিন লাগানো হয় তাকে বলা হয় রিকম্বিনেন্ট ডিএনএ বা RDNA। এসব RDNA সমৃদ্ধ জীবকোষকে বলা হয় Genetically Modified Organism (GMO)।

জিন জোড়া লাগানো বা রিকম্বিনেন্ট ডিএনএ বা আরডিএনএ সত্যিকার অর্থে কী কাজে মথার্থভাবে ব্যবহার করা যায় সেটি বের করার জন্য বিজ্ঞানীরা প্রতিনিয়ত গবেষণা করে যাচ্ছেন। বহুত জীবপ্রযুক্তির এই অত্যাধুনিক শাখার উদ্দেশ্য হচ্ছে, কোনো জীবের নতুন ও কাঙ্ক্ষিত বৈশিষ্ট্য পরিবর্তনের লক্ষ্যে ঐ জীবের জিন পৃথক করে অন্য জীবের জিনের সাথে সংযুক্ত করে নতুন জিন বা ডিএনএ তৈরি করা। তাই জেনেটিক



চিত্র 1.16 : বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট উদ্ভাবিত বেঙ্গলি রঙের ধান



ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের সংজ্ঞা হিসেবে আমরা বলতে পারি, জীবদেহে জিনোমকে প্রয়োজন অনুযায়ী সাজিয়ে কিংবা একাধিক জীবের জিনোমকে জোড়া লাগিয়ে নতুন জীবকোষ সৃষ্টির কৌশলই হচ্ছে জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং। উচ্চফলনশীল জাতের ধান ও অন্যান্য ফসল এবং প্রাণীর জিনের সাথে সাধারণ জিন জোড়া লাগিয়ে নতুন ধরনের আরো উচ্চফলনশীল বা হাইব্রিড জাতের শস্য, প্রাণী ও মৎস্য সম্পদ উৎপাদিত হয়েছে। এটিই সহজ ভাষায়, জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং।

### জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং-এর ব্যবহার ও প্রয়োজনীয়তা

বিশ্বের অনেক দেশেরই জনসংখ্যার তুলনায় খাদ্য ঘাটতি একটি সাধারণ সমস্যা, যার জন্য খাদ্য আমদানি করতে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা ব্যয় করতে হয়। এই সমস্যা সমাধানে বর্তমানে জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং প্রয়োগ করে বহুগুণে খাদ্যশস্য উৎপাদন সম্ভব হচ্ছে। এই বিষয়টি হাইব্রিড নামে বহুল পরিচিত। প্রাণীর আকার এবং মাংসবৃদ্ধি, দুধে আমিষের পরিমাণ বাড়ানো এইধরনের কাজ করেও খাদ্য সমস্যা মেটানোর চেষ্টা করা হচ্ছে।

কৌশলগতভাবে পরিবর্তিত E.Coli ব্যাকটেরিয়া এবং ইস্ট হতে মানবদেহের ইনসুলিন তৈরি, হরমোন বৃদ্ধি, এবং বামনত্ব, ভাইরাসজনিত রোগ, ক্যান্সার, এইডস ইত্যাদির চিকিৎসায় জিন প্রযুক্তির ব্যবহার ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে। জিন প্রকৌশলের মাধ্যমে জিন স্থানান্তর প্রক্রিয়ায় কাজিফত বৈশিষ্ট্য অল্প সময়ে সুচারুরূপে স্থানান্তর করা সম্ভব হওয়ার কারণে সংশ্লিষ্ট উদ্ভাবক বা উদ্যোক্তাগণের নিকট প্রচলিত প্রজননের তুলনায় এ প্রযুক্তিটি অধিক গুরুত্ব পাচ্ছে।

আমাদের দেশেও এ প্রযুক্তির উপর বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট, পাট গবেষণা ইনস্টিটিউট, আখ গবেষণা ইনস্টিটিউট ইত্যাদি বেশ কিছু সংস্থা কাজ করে অনেক উচ্চফলনশীল জাতের শস্যবীজ উৎপাদন করেছে। এসব বীজ ব্যবহার করে শস্যও কয়েকগুণ বেশি হারে উৎপাদন সম্ভব হচ্ছে। স্বাধীনতার অব্যবহিত পরই আমাদের দেশে ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট উচ্চ ফলনশীল ব্রি (BRRI) জাতের বহু ভ্যারাইটির ধানের বীজ উদ্ভাবন করেছে। এই ইনিস্টিটিউটে উদ্ভাবিত পার্পল কালার (বেগুনি রঙের)-এর উফশী ধান দেশ-বিদেশে ব্যাপক সাড়া ফেলেছে। সম্প্রতি বাংলাদেশের প্রথিতযশা বিজ্ঞানী জনাব মাকসুদুল আলমের নেতৃত্বে একদল গবেষক পাটের জিনোম সিকোয়েন্স আবিষ্কার আমাদের দেশের সোনালি আঁশকে বিশ্ব দরবারে হারানো ঐতিহ্যকে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেছে। এ ছাড়াও ভুট্টা, ধান, তুলা, টমেটো, পেঁপেসহ অসংখ্য ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধি, রোগ প্রতিরোধক ক্ষমতা বাড়ানো, আগাছা সহিষ্ণু করা, পোকামাকড় প্রতিরোধী করা এবং বিভিন্ন জাতের মৎস্য সম্পদ (বিশেষত মাগুর, কার্প, তেলাপিয়া ইত্যাদি) বৃদ্ধির জন্য জিন প্রকৌশলকে কাজে লাগানো হচ্ছে।

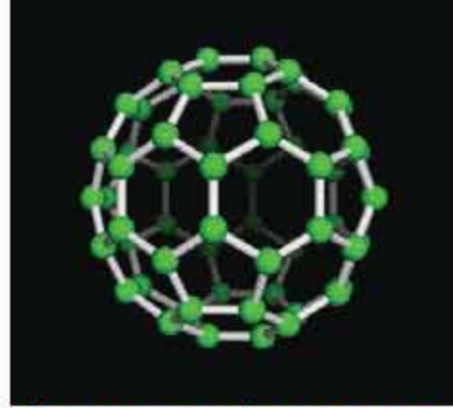
বিজ্ঞানীরা গবেষণা করে দেখেছেন যে, জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং-এর বহুমাত্রিক ব্যবহারের পাশাপাশি এর কিছু বিরূপ প্রতিক্রিয়াও রয়েছে। তার মাঝে উল্লেখযোগ্যগুলো হচ্ছে, জীববৈচিত্র্য অস্বাভাবিক পরিবর্তনের কারণে জীবজগতে মারাত্মক বিপর্যয় সৃষ্টি, অনৈতিক বা অযাচিতভাবে জিনের স্থানান্তর, মানবদেহে প্রয়োগযোগ্য এন্টিবায়োটিক ওষুধের কার্যকারিতা হ্রাস ও অ্যালার্জির উদ্ভব কিংবা ভয়াবহ ও জীববিধ্বংসী প্রজাতি বা ভাইরাস উদ্ভবের আশঙ্কা ইত্যাদি।

### ১.৩.১০ ন্যানোটেকনোলজি (Nanotechnology)

10<sup>-9</sup> মিটারকে ন্যানোমিটার বলে এবং বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তি ব্যবহার করে 1 থেকে 100 ন্যানোমিটার আকৃতির কোনো কিছু তৈরি করা এবং ব্যবহার করাকে ন্যানোটেকনোলজি বলে। এই আকৃতির কোনো কিছু তৈরি করা হলে তাকে সাধারণভাবে ন্যানো-পার্টিকেল বলে। ক্ষুদ্র আকৃতির জন্য ন্যানো পার্টিকেলের পৃষ্ঠদেশের পরিমাণ তুলনামূলকভাবে অনেক বেশি; সেজন্য রাসায়নিকভাবে অনেক বেশি ক্রিয়াশীল হয়ে থাকে। শুধু তাই নয়, একটি দ্রব্যের বড় আকৃতিতে যে ধর্ম বা গুণাগুণ থাকে, ন্যানো পার্টিকেল হলে তার

ভেতর কোয়ান্টাম পদার্থ বিজ্ঞানের প্রভাব দেখা যেতে শুরু করে বলে সেই ধর্ম বা গুণাগুণ পরিবর্তন দেখা দিতে পারে। উদাহরণ দেওয়ার জন্য বলা যায় অনেক খাতুর কাঠিন্য ন্যানো আকৃতিতে সাধারণ অবস্থা থেকে সাতগুণ বেশি হতে পারে। এই কারণে এই ন্যানো-পার্টিকেল নিয়ে বিজ্ঞানীরা বিশেষভাবে কৌতুহলী।

রসায়নবিদেরা অনেকদিন থেকে ন্যানো ব্যাসার্ধের গলিয়ার তৈরি করে আসছেন এবং ইন্টিগ্রেটেড সার্কিটের চিপস তৈরি করার সময় প্রযুক্তিবিদেরা সেখানে ন্যানো আকৃতির ডিজাইন করে আসছেন, কিছু শুধু সাম্প্রতিক সময়ে ন্যানো পার্টিকেল তৈরি এবং ব্যবহার করার জন্য প্রয়োজনীয় টুল তৈরি হয়েছে এবং ন্যানো পার্টিকেলের অগৎ সত্যিকার অর্থে উন্মুক্ত হয়েছে।



চিত্র 1.17 : 60 টি কার্বন পরমাণু দিয়ে তৈরি ন্যানো পার্টিকেল  $C_{60}$

এ প্রযুক্তির ব্যবহারের মাধ্যমে বৃহৎ ক্ষেত্রে পণ্যোৎপাদন সম্ভব হচ্ছে এবং উৎপাদিত পণ্য আকারে সুন্দর ও ছোট হলেও অত্যন্ত মজবুত, বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী, টেকসই ও হালকা হয়।

‘আগামী বিশ্ব হবে ন্যানোটেকনোলজির বিশ্ব’,—এই প্রতিবাদ্যকে সামনে রেখে স্মার্ট ওয়র্কের মাধ্যমে প্রাণবন্তী ক্যান্সার ইত্যাদি দুরারোগ্য ব্যাধি হতে মুক্তি, প্রতিরক্ষা ব্যবস্থায় ন্যানো রোবট, কোয়ান্টাম কম্পিউটিং, বিশ্বব্যাপী বৃহৎ কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি, কার্যকরী ও সম্ভার শক্তি উৎপাদনসহ পানি ও বায়ুদূষণ কমানো সম্ভব হবে মর্মে গবেষকগণ আমাদের আশার বাণী শুনিয়েছেন। ন্যানো প্রযুক্তি দুটি পদ্ধতিতে ব্যবহৃত হয় :

(ক) ত্বরণ থেকে বৃহৎ (Bottom Up) : এই পদ্ধতিতে ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র আণবিক উপাদান থেকে শুরু করে ধীরে ধীরে বড় কোনো জিনিস তৈরি করা হয়।

(খ) বৃহৎ থেকে ত্বরণ (Top Down) : এই পদ্ধতিতে একটু বড় আকৃতির কিছু থেকে শুরু করে তাকে ভেঙে ছোট করতে করতে কোনো বস্তুকে ক্ষুদ্রাকৃতির আকৃতিতে পরিণত করা হয়।

### ন্যানো প্রযুক্তির ব্যবহার

১. কম্পিউটারের স্বর্ভগ্নাত্মে ব্যবহার : প্রসেসরের উচ্চ গতি, দীর্ঘস্থায়িত্ব, কম শক্তি খরচ ইত্যাদি বৈশিষ্ট্যে ব্যবহার্য। একই সঙ্গে ডিসকে ও কোয়ান্টাম প্রযুক্তির উন্নয়নে সহায়তা করে।

২. চিকিৎসা ক্ষেত্রে : ন্যানো-রোবট ব্যবহার করে অপারেশন করা, যেমন— এনজিওপ্লাস্টি সরাসরি রোগাক্রান্ত সেলে চিকিৎসা প্রদান করা, যেমন— ন্যানো ক্রায়োসার্জারি, ডায়াগনোসিস করা, যেমন— এন্ডোসকপি, এনজিওগ্রাম, কলোনোস্কোপি ইত্যাদি।

৩. খাদ্যশিল্পে : খাদ্যজাত দ্রব্য প্যাকেটিং, খাদ্যে স্বাদ তৈরিতে, খাদ্যের গুণাগুণ রক্ষার্থে ব্যবহৃত বিভিন্ন ধরনের দ্রব্যাদি তৈরির জন্য ব্যবহৃত হয়।

৪. ছালানি ক্ষেত্রে : ছালানি উৎসের বিকল্প হিসেবে বিভিন্ন ধরনের ফুরেল তৈরির কাজে, যেমন— হাইড্রোজেন আম্ল থেকে ফুরেল, সৌরবিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য সৌরকোষ তৈরির কাজে।

৫. যোগাযোগ ক্ষেত্রে : হালকা ওজনের ও কম ছালানি চাহিদাসম্পন্ন পাড়ি প্রভুতকরণে।

৬. খেলাধুলার সামগ্রী তৈরিতে : বিভিন্ন ধরনের খেলাধুলার সামগ্রী যেমন— ক্রিকেট, টেনিস বলের স্থায়িত্ব বৃদ্ধির জন্য, ফুটবল বা গলফ বলের বাতাসের ভারসাম্য রক্ষার্থে।

৭. **বায়ু ও পানি দূষণ রোধে** : শিল্প কারখানার ক্ষতিকর রাসায়নিক বর্জ্যকে ন্যানো পার্টিকেল ব্যবহার করে অক্ষতিকর বস্তুতে রূপান্তর করে পানিতে নিষ্কাশিত করা; যেমন— ট্যানারি শিল্পের বর্জ্যকে এই প্রযুক্তির সাহায্যে দূষণমুক্ত করে নদীর পানির দূষণ প্রতিরোধে সহায়তা করে। তেমনিভাবে গাড়ি ও শিল্পকারখানার নির্গত বিষাক্ত ধোঁয়া ন্যানো পার্টিকেলের সহায়তায় দূষণমুক্ত গ্যাসে পরিণত করে বায়ু দূষণ রোধ করা যায়।

৮. **প্রসাধন শিল্পে** : প্রসাধনীতে জিংক অক্সাইড-এর ন্যানো পার্টিকেল যুক্ত হওয়ায় ত্বকের ক্যান্সাররোধ সম্ভব হয়েছে। সেই সাথে সানস্ক্রিন ও ময়েশ্চারাইজার তৈরির কাজে ব্যবহার্য রাসায়নিক পদার্থ তৈরির ক্ষেত্রে এবং এন্টি-এজিং ক্রিম তৈরিতেও ন্যানো-টেকনোলজি ব্যবহৃত হয়।

তবে উল্লেখ্য যে ন্যানো পার্টিকেলের ব্যবহারে নানাবিধ সুবিধা থাকলেও অন্যদিকে ন্যানো পার্টিকেল দিয়ে প্রাণঘাতী অস্ত্র তৈরি, প্রচলিত জ্বালানী গ্যাস-তৈল ইত্যাদির বিকল্প হিসেবে এর অপব্যবহার, অভিজাত শ্রেণির উষ্টবের দরুন ধনী ও নির্ধনের পার্থক্য চরম মাত্রায় বৃদ্ধি, কালোবাজারী এবং সর্বোপরি মানব শরীরের কোষের গঠনশৈলী পরিবর্তনসহ কোষ মেরে ফেলার মতো ক্ষতিকারক প্রযুক্তি হিসেবে ন্যানো প্রযুক্তির ব্যবহার এখনো প্রশ্নবিদ্ধ অবস্থান হতে বেরিয়ে আসতে সক্ষম হয়নি।

### ১.৪ তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহারে নৈতিকতা (Ethics of ICT usages)

নৈতিকতা হচ্ছে এক ধরনের মানদণ্ড যা আচরণ, কাজ এবং পছন্দের ক্ষেত্রে সহায়তা করে। এটি ঔচিত্য ও অনুচিত্যের মাপকাঠিও বটে, কেননা মানবধর্ম এবং নৈতিকতা অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। অনৈতিক ও বেআইনি এক বিষয় নয়। অনেক অনৈতিক কাজ আইন বিরুদ্ধ নয়, কিন্তু সকল আইন বিরুদ্ধ কাজ অবশ্যই অনৈতিক। তবে সাম্প্রতিক কালে তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহার করে নানা ধরনের অনৈতিক এবং অন্যায় কাজের মাত্রা এত বেড়ে গেছে যে পৃথিবীর অনেক দেশেই সেগুলোকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য কঠোর আইন প্রণয়ন করেছে। কাজেই একসময় যে কাজটি শুধু অনৈতিক ছিল সেটি অনেকক্ষেত্রে এখন বেআইনি হয়ে গেছে, অর্থাৎ সামান্যসামান্য কাউকে গালাগাল করে একজন পার পেয়ে যেতে পারে, কিন্তু ফেসবুকে কাউকে গালাগাল করে একজন জেলে চলে যেতে পারে।

যেহেতু পৃথিবীর প্রায় সকল মানুষ কোনো না কোনোভাবে তথ্য প্রযুক্তির সাথে সম্পৃক্ত তাই এর ব্যবহারের নৈতিকতার বিষয়টি খুব গুরুত্ব দিয়ে নেওয়া উচিত। গুরুত্ব না দেয়া হলে একজন অনৈতিক কাজ দিয়ে শুরু করে খুব সহজেই অন্যায় এবং অপরাধমূলক কাজে জড়িয়ে পড়তে পারে। তাই সকল কম্পিউটার ব্যবহারকারীদের তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহারে নৈতিকতা সম্পর্কে অবহিত এবং যথাযথভাবে রপ্ত হওয়ার কোনো বিকল্প নেই।

কম্পিউটার ইথিক্স ইনস্টিটিউট ১৯৯২ সালে কম্পিউটার ব্যবহারকারীদের জন্য তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির বিষয়ে দশটি সুনির্দিষ্ট নির্দেশনা দিয়েছে। সেগুলো হচ্ছে :

১. তুমি কম্পিউটার ব্যবহার করে অন্যের ক্ষতি করবে না।
২. তুমি অন্যের কম্পিউটার সংক্রান্ত কাজে হস্তক্ষেপ করবে না।
৩. তুমি অন্য কারও ফাইলে নাক গলাবে না।
৪. তুমি চুরির উদ্দেশ্যে কম্পিউটার ব্যবহার করবে না।
৫. তুমি মিথ্যা তথ্যের জন্য কম্পিউটার ব্যবহার করবে না।



৬. তুমি লাইসেন্সবিহীন সফটওয়্যার ব্যবহার ও কপি করবে না।
৭. তুমি বিনা অনুমতিতে কম্পিউটার সংক্রান্ত অন্যের রিসোর্স ব্যবহার করবে না।
৮. তুমি অন্যের কাজকে নিজের কাজ বলে চালিয়ে দেবে না।
৯. তুমি তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহারের আগে সমাজের উপর এর প্রভাব সম্পর্কে চিন্তা করবে।
১০. তুমি কম্পিউটার ব্যবহার করার সময় অন্যের ভালোমন্দ বিবেচনা করবে এবং শ্রদ্ধাবোধ প্রদর্শন করবে।

কম্পিউটার, ইন্টারনেট কিংবা মোবাইল ফোন ব্যবহার করার সময় উপরে বর্ণিত তথ্য প্রযুক্তিগত নৈতিক নির্দেশনাগুলো সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা থাকা খুবই জরুরি।

আজকাল ইন্টারনেটের মাধ্যমে অনেক ধরনের অনৈতিক এবং অপরাধমূলক কাজ সংঘটিত হয়। এর ভেতর বহুল প্রচলিতগুলো হচ্ছে :

**হ্যাকিং (Hacking) :** কোনো কম্পিউটার সিস্টেম, নেটওয়ার্ক, ডেটার উপর অননুমোদিতভাবে অধিকার (Access) লাভ করার উপায়কে হ্যাকিং বলে। এতে ব্যক্তির তথ্যের বা সিস্টেমের ক্ষতিসাধন করা হয় এবং অনেকক্ষেত্রে কোনো ক্ষতি না করে শুধু নিরাপত্তা ত্রুটি সম্পর্কে কম্পিউটার ব্যবহারকারীকে জানান দেয়া হয়। যে সব ব্যক্তি/ব্যক্তিবর্গ এ ধরনের কর্মে/অপকর্মের সাথে জড়িত থাকে তাদের হ্যাকার বলে।

**ফিশিং (Phishing) :** ফিশিং করার অর্থ ই-মেইল বা মেসেজের মাধ্যমে ওয়েবসাইট ব্যবহারকারীকে নকল বা ফেইক ওয়েবসাইটে নিয়ে কৌশলে তার বিশ্বস্ততা অর্জন করা এবং তারপর ব্যবহারকারীর অ্যাকসেস কোড, পিন নম্বর, ক্রেডিট কার্ড নম্বর, পাসওয়ার্ড, ব্যাংক একাউন্ট নম্বরের মতো গুরুত্বপূর্ণ তথ্য চুরি করে তাদের নানা ধরনের বিপদে ফেলা।

**স্প্যামিং (Spaming) :** অনাকাঙ্ক্ষিত বা অবাঞ্ছিত ই-মেইল কিংবা মেসেজ পাঠানোকে স্প্যামিং বলে। এই কাজ যারা করে তাদেরকে স্প্যামার বলা হয়। যখন কোনো ব্যবহারকারী কোনো ওয়েবসাইট ভিজিট করেন বা কোনো গ্রুপের মেসেজ বোর্ডে প্রবেশ করেন তখন স্প্যামাররা সেখান থেকে ই-মেইল অ্যাড্রেস সংগ্রহ করে ব্যবহারকারীর ই-মেইলে বিভিন্ন প্রতারণামূলক মেসেজ পাঠায়।

**সফটওয়্যার পাইরেসি (Software piracy) :** সফটওয়্যার একটি বুদ্ধিবৃত্তিক প্রযুক্তি পণ্য, যা প্রোগ্রামারগণ পেশাগত দক্ষতা, মেধা আর মননের সর্বোচ্চ প্রয়োগ ঘটিয়ে তৈরি করে থাকেন এবং এগুলোর তাঁরাই স্বত্বাধিকারী হন। লাইসেন্সবিহীনভাবে বা স্বত্বাধিকারীর অনুমোদন ব্যতিরেকে এ ধরনের সফটওয়্যার কপি করা, নিজের নামে কিংবা কোনো প্রকার পরিবর্তন-পরিবর্ধন করে ব্যবহারের সুযোগ নেয়া পাইরেসির আওতায় পড়ে। Business Software Alliance (BSA)-এর সূত্রমতে ব্যবহৃত সকল সফটওয়্যারের প্রায় ৩৬ ভাগই পাইরেটেড সফটওয়্যার। কপিরাইট আইন দ্বারা উন্নত দেশগুলোয় এই ধরনের অপরাধ প্রতিহত করার চেষ্টা অব্যাহত রয়েছে।

**প্লেজিয়ারিজম (Plagiarism) :** কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের কোনো লেখা, সাহিত্যকর্ম, গবেষণাপত্র, সম্পাদনা কর্ম ইত্যাদি হুবহু নকল বা আংশিক পরিবর্তন করে নিজের নামে প্রকাশ করাই হলো প্লেজিয়ারিজম। সঠিক সূত্র উল্লেখ ছাড়া কোনো কিছু রেফারেন্স হিসেবে ব্যবহারও বেআইনি কাজ তথা প্লেজিয়ারিজমের আওতায় পড়ে।

## সাইবার আইন

সাইবার অপরাধ দমনে বিভিন্ন দেশেই আইন চালু আছে। আমাদের দেশে ২০০৬ সালে প্রণীত ‘তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন-২০০৬’-এর ৫৭(১) ধারামতে, ‘যদি কোনো ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে ওয়েবসাইট বা অন্য কোনো ইলেকট্রনিক বিন্যাসে এমন কিছু প্রকাশ বা সম্প্রচার করে যা মিথ্যা ও অশ্লীল, যার দ্বারা কারও মানহানি ঘটে বা ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ণ হয়, আর এ ধরনের তথ্যগুলোর মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির বিরুদ্ধে উদ্ভাষিত প্রদান করা হলে অনধিক দশ বছর কারাদণ্ড এবং অনধিক এক কোটি টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হওয়ার বিধান রয়েছে’। এছাড়া, পর্ণগ্রাফি আইন-২০১২-তে বর্ণিত আছে, ‘কোনো ব্যক্তি ইন্টারনেট বা ওয়েবসাইট বা মোবাইল ফোন বা অন্য কোনো ইলেকট্রনিক ডিভাইসের মাধ্যমে পর্ণগ্রাফি সরবরাহ করলে সর্বোচ্চ ৫ বছর সশ্রম কারাদণ্ড এবং ২ লক্ষ টাকা পর্যন্ত অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হবেন।’

সর্বশেষ ২০১৮ সালে আমাদের দেশে ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন প্রণীত হয়, যার আংশিক উল্লেখ করা হলো :

- কোনো ব্যক্তি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পরিকাঠামোয় বেআইনি প্রবেশ করে ক্ষতিসাধন, বিনষ্ট বা অকার্যকরের চেষ্টা কিংবা কম্পিউটার সিস্টেম, নেটওয়ার্ক বা প্রোগ্রাম ধ্বংস/পরিবর্তন বা অকার্যকর করতে পারবেন না।
- ইলেকট্রনিক ডিভাইস, কম্পিউটার সিস্টেমে অবৈধভাবে প্রবেশ করতে পারবেন না, সেখান থেকে কোনো তথ্য বা উদ্ধৃতাংশ বা উপাত্তের অনুলিপি সংগ্রহ করতে পারবেন না।
- ডিজিটাল বা ইলেকট্রনিক মাধ্যম ব্যবহার করে কারো সাথে ইচ্ছাকৃতভাবে প্রতারণা, জালিয়াতি বা ছদ্মবেশ ধারণ করতে পারবেন না।
- ডিজিটাল বা ইলেকট্রনিক মাধ্যম ব্যবহার করে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ বা মুক্তিযুদ্ধের চেতনা, জাতির পিতা, জাতীয় পতাকার বিরুদ্ধে প্রচার বা অপপ্রচার কিংবা এতে মদদ দিতে পারবেন না।
- রাষ্ট্রের অখণ্ডতা, নিরাপত্তা, সার্বভৌমত্ব ও ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ণ হয় এমন বিভ্রান্তিকর তথ্য অপপ্রচার বা কার্যকলাপ, ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত করে বা জাতিগত ঘৃণা-উদ্ভাষিত বা বিভেদ/বিদ্বেষ সৃষ্টি করে কিংবা সামাজিকভাবে বিশৃঙ্খলার জন্ম দেয় এরূপ কোনো কার্যক্রম ডিজিটাল বা ইলেকট্রনিক মাধ্যম ব্যবহার করে করা যাবে না।
- ডিজিটাল বা ইলেকট্রনিক মাধ্যম ব্যবহার করে উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে ব্যক্তিগত ভাবমূর্তি নষ্ট, অপমান বা অপদস্ত করা কিংবা ভয়ভীতি বা হুমকি প্রদর্শন করা যাবে না।
- ইলেকট্রনিক বা ডিজিটাল ডিভাইস ব্যবহার করে ব্যাংক, বীমা ইত্যাদি আর্থিক প্রতিষ্ঠান কিংবা সরকারি, আধাসরকারি বা স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানে অবৈধ অনুপ্রবেশ করে আর্থিক ক্ষতি বা তহরুপ কিংবা অত্যন্ত গোপনীয় তথ্য চুরি, তথ্য পাচার করা যাবে না।

ডিজিটাল আইনের আওতায় উল্লিখিত কৃত অপরাধের জন্য বিভিন্ন মেয়াদের শাস্তি এবং আর্থিক দণ্ড প্রদানের বিধান রাখা হয়েছে।

তাই আমাদের জীবনের অন্যান্য প্রতিটি সেক্টরের ন্যায় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহারের ক্ষেত্রে বিবেক, বুদ্ধি ও বিবেচনাকে নৈতিকতার মানদণ্ড হিসেবে ব্যবহার করে সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধিসহ সবধরনের অপরাধমূলক কাজের প্রবণতা হতে পরিত্রাণ পেতে পারি।

## ডিম খরনের অপরাধ

### অ্যান্ড্রয়েড : প্রযুক্তি বোড়লদের বিরুদ্ধে শুনানি



চিত্র 1.18 : বাংলাদেশের সংবাদ মাধ্যমে তথ্যপ্রযুক্তির বড় বড় কোম্পানী সম্পর্কিত খবর

আমরা যখন সাইবার ট্রাইম নিয়ে কথা বলি তখন সবসময়ই ব্যক্তিগত অপরাধ কিংবা ছোটখাটো অপরাধী সংগঠনের অপরাধ নিয়ে কথা বলি। কিছু আমরা অনেকেই জানি না যে সারা পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ সফটওয়্যার কোম্পানিগুলো অনেক বড় বড় অপরাধ করে শুধু দোষী সাব্যস্ত হয়নি তার জন্য শাস্তি ভোগ করেছে। ফেসবুক তার ব্যবহারকারীদের ব্যক্তিগত তথ্য ক্যামব্রিজ এনালিটিকাকে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ব্যবহার করতে দিয়ে অনেক বড় অপরাধ করেছিল। হোয়াটসঅ্যাপ সম্পর্কে বিশ্রান্তিকর তথ্য দেওয়ার জন্য তাদেরকে ১১০ মিলিয়ন ইউরো জরিমানা করা হয়েছিল। কর ফাঁকি

দেওয়ার জন্য ২০১৬ সালে অ্যাপেল কোম্পানিকে আমেরিকাকে ১৪.৫ বিলিয়ন ইউরো ফেরত দিতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আইন ভঙ্গ করে অন্যান্য ছোট কোম্পানির অস্তিত্ব বিপর্যয় করে বিশ্বাস ভঙ্গ করার জন্য গুগলকে এখন পর্যন্ত প্রায় ১০ বিলিয়ন ইউরো জরিমানা করা হয়েছে। নিয়ম বহির্ভূত কাজের জন্য জার্মানিতে আমাজনের বিরুদ্ধে তদন্ত হচ্ছে। এরকম উদাহরণের কোনো শেষ নেই, এই বড়ো বড়ো কোম্পানিগুলোর কাছে পৃথিবীর সবচেয়ে বেশি ডেটা। যারা ডেটা নিয়ন্ত্রণ করে, তারা পৃথিবীকে নিয়ন্ত্রণ করে। কাজেই একধরনের আশঙ্কা আছে যে পৃথিবীর মানুষের সচেতন না হলে পুরো পৃথিবী একসময় করেকটি দৈত্যাকৃতির সফটওয়্যার কোম্পানির হাতে নিয়ন্ত্রিত হবে। সেটি যেন না হতে পারে সেজন্য সবার সচেতন থাকার প্রয়োজন আছে।

## ১.৫ সমাজ জীবনে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির প্রভাব (Impact of ICT in Social Life)

বর্তমান যুগ তথ্য প্রযুক্তির যুগ। পৃথিবীর মানুষ তথ্য প্রযুক্তির সক্রিয় সহযোগিতা ছাড়া এখন একটি দিনও অতিবাহিত করতে পারে না। এক কথায় মানুষের জীবনবাহার সর্বস্তরে এর একটি অত্যাবশ্যিক প্রভাব রয়েছে।

### ১.৫.১ তথ্য প্রযুক্তির ইতিবাচক প্রভাব

শিক্ষা, চিকিৎসা, বাসস্থান, অফিস-আদালত, ব্যাংক-বীমা ও অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠান, কলকারখানা, যোগাযোগ ব্যবস্থা, কৃষি, প্রকাশনা, শিল্প-সংস্কৃতি ইত্যাদি সমাজের সর্বক্ষেত্রে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির বহুবুদী প্রয়োগ পরিলক্ষিত হয়ে আসছে। আইসিটির প্রভাবাধীন উন্নীত বিভিন্ন ক্ষেত্রের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা নিয়ে প্রদত্ত হলো।

শিক্ষা ক্ষেত্রে : তথ্য প্রযুক্তির সকল প্রয়োগ দ্বারা বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তির আবেদন, ফি ইত্যাদি পরিশোধ, ভর্তি, ফলাফল তৈরি ও প্রকাশ, রেজিস্ট্রেশন বা পরীক্ষার ফরম পূরণ, বিভিন্ন ফলাফল বিশ্লেষণ,



শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মান নির্ধারণ, সংশ্লিষ্ট বিষয়ে সঠিক ও প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ ইত্যাদি কাজে অত্যন্ত সহজ, দ্রুত ও নিখুঁতভাবে সম্পন্ন করা সম্ভব হচ্ছে। তাছাড়া, দেশে অবস্থান করেও শিক্ষার্থীগণ বিশ্বসেরা বিদেশি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ভর্তি, পড়াশুনা ও পরীক্ষায় অংশগ্রহণের মাধ্যমে ডিগ্রি অর্জন করতে সক্ষম হচ্ছে তথ্য প্রযুক্তির কল্যাণেই।

**বিজ্ঞান ও চিকিৎসাক্ষেত্রে :** আমরা জানি, বিজ্ঞানের ক্রমোন্নতির ধারায় তথ্য প্রযুক্তি বর্তমান উৎকর্ষতায় উন্নীত হয়েছে। ঠিক একইভাবে, তথ্য প্রযুক্তির প্রয়োগের মাধ্যমেই কিন্তু বিজ্ঞানের বহুমাত্রিক অগ্রগতিকে বহুগুণে ত্বরান্বিত করে চলেছে। অন্যান্য সেক্টর তো রয়েছেই, শুধু চিকিৎসাক্ষেত্রে পর্যালোচনা করলে তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহারের সুফল বলে শেষ করা যাবে না। অত্যাধুনিক পদ্ধতিতে ও নিখুঁতভাবে রোগ নির্ণয় থেকে শুরু করে চিকিৎসা সেবা দেয়া, ঘরে বসে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকগণের পরামর্শ ও সর্বাধুনিক চিকিৎসা পদ্ধতি জানা, সর্বশেষ আবিষ্কৃত ওষুধ সংগ্রহ ও ব্যবহারে সক্ষমতা এনে দিয়েছে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি।

**ব্যাংক, বীমা ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে :** ব্যাংকে অর্থ জমা-উত্তোলন, ক্লিয়ারিং হাউস বা আন্তঃব্যাংক লেনদেন, রেমিট্যান্স আদান-প্রদান, স্মার্ট কার্ড ব্যবহারে এটিএম বুথের মাধ্যমে অর্থ উত্তোলন, মোবাইল ব্যাংকিং, অনলাইন ব্যাংকিং, অনলাইনে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের বিল গ্রহণ, দীর্ঘ বা স্বল্পমেয়াদি ঋণ অনুমোদন, ঋণের অর্থের পরিমাণ নির্ধারণ, সুদের হার নির্ণয়, মেয়াদ নির্ধারণ, শেয়ার কেনা-বেচা ইত্যাদি বহুবিধ কার্যক্রম তথ্য প্রযুক্তির কল্যাণে আজকাল অতি সহজেই সম্পন্ন করা যাচ্ছে। মোট কথা, আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর ব্যবস্থাপনা ও গ্রাহকসেবায় স্বচ্ছতা ও গতিশীলতা আনয়নে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ভূমিকা প্রশংসনীয়।

**অফিস-আদালতে :** আজকের বিশ্ব ব্যবস্থায় প্রায় সবধরনের প্রতিষ্ঠানের অফিস ব্যবস্থাপনায় পেশাদারিত্ব, স্বচ্ছতা-জবাবদিহিতা, সময়ের সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত তথ্য প্রযুক্তির প্রয়োগ একটি অনিবার্য বিষয়। প্রজেক্ট প্রোফাইল তৈরি, কর্মী ব্যবস্থাপনা, টেন্ডার সংক্রান্ত কার্যক্রম, কমিশন, বেতন-ভাতা নির্ধারণ থেকে শুরু করে তথ্য সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও প্রক্রিয়াকরণ-বিতরণে টেলিফোন, কম্পিউটার, প্রিন্টার, ইন্টারনেট প্রযুক্তির অবাধ ব্যবহার হয়ে আসছে। তাছাড়া, বিচারিক কার্যক্রমেও একজন বিচারপ্রার্থী অনলাইনে মামলা দায়েরসহ সাক্ষ্যপ্রমাণাদি সেখানে উপস্থাপন করতে পারছেন, যার ফলে বিচার প্রক্রিয়াতেও গতিশীলতা বেড়েছে অনেকাংশে।

**শিল্প ক্ষেত্রে :** বিশ্ববাজার অনুসন্ধানের মাধ্যমে কলকারখানার কৌচামাল সংগ্রহ, পণ্যের ডিজাইন, উৎপাদন ও মাননিয়ন্ত্রণে উন্নত যন্ত্রপাতি সংগ্রহ ও ব্যবহার, ঝুঁকিপূর্ণ ও প্রতিকূল পরিবেশে কম্পিউটার নিয়ন্ত্রিত যন্ত্র রোবটের ব্যবহার, জীবাণুমুক্ত খাদ্যপণ্য তৈরির ক্ষেত্রে স্বয়ংক্রিয় ইলেকট্রনিক যন্ত্রপাতির ব্যবহার, উৎপাদিত পণ্যের চাহিদা নিরূপণ, উৎপাদন ব্যবস্থাপনা, বাজার ব্যবস্থাপনা, মজুদ ব্যবস্থাপনা, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, উৎপাদিত পণ্য ক্রেতা সাধারণের কাছে আকর্ষণীয়ভাবে উপস্থাপন, অনলাইনে অর্ডার গ্রহণ, পণ্য সরবরাহ, বিশ্ববাজার অর্থনীতির সাথে ভারসাম্য রক্ষা, বিশ্ববাজার প্রতিযোগিতায় প্রবেশ, প্রাধান্য বিস্তার ইত্যাদি শিল্পসংশ্লিষ্ট প্রতিটি ক্ষেত্রে তথ্য প্রযুক্তির ভূমিকা অনস্বীকার্য।

**কৃষি ক্ষেত্রে :** কৃষি প্রধান দেশ হিসেবে বাংলাদেশসহ বিশ্বের প্রতিটি দেশের কৃষি ক্ষেত্রে তথ্য প্রযুক্তির প্রয়োগ নতুন দিগন্তের সূচনা করেছে বহু পূর্বেই। জমির ধরন, মাটির গুণগতমান, স্থানীয় আবহাওয়ার ধরন, শস্যবীজ প্রাপ্তি, দেশি বা বিশ্ববাজারে চাহিদানুযায়ী সকল তথ্য জেনে লাভজনক শস্য নির্বাচন সম্ভব তথ্য প্রযুক্তির মাধ্যমে। বীজ বপনের সময় নির্ধারণ ও তার পদ্ধতি, জমির উর্বরতা বৃদ্ধির কৌশল, জমি তৈরির প্রক্রিয়া, পোকানাকড় অক্রমণের ধরন, পোকার প্রকৃতি নির্ণয় ও নিধন, রোগ নির্ণয় ও প্রতিরোধ ব্যবস্থা, ইত্যাদি কৃষি সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যক্রম তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির কল্যাণে সম্ভব হচ্ছে।



চিত্র 1.19 : কৃষি সংক্রান্ত a2i এর সহায়তায় নির্মিত একটি ওয়েবসাইট

**উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থার :** আজকাল তথ্য প্রযুক্তি ছাড়া যোগাযোগ ব্যবস্থা কল্পনাও করা যায় না। ব্যক্তিগত তথ্য যোগাযোগ থেকে শুরু করে বিভিন্ন ধরনের গণগরিবহন পর্যন্ত সর্বস্তরের যোগাযোগ ব্যবস্থার তথ্য প্রযুক্তির প্রয়োগে ব্যাপক সুযোগ সৃষ্টি হচ্ছে। মোবাইল ফোন, ইন্টারনেট, ই-মেইল, ই-কমার্স, টেলিকমিউনিকেশন, গুগলারসেস যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নততর যোগাযোগ ব্যবস্থা নিশ্চিত করেছে।

**শিল্প সংস্কৃতি ও বিনোদনের ক্ষেত্রে :** তথ্য প্রযুক্তির কল্যাণে সারা বিশ্বে শিল্প-সংস্কৃতি ও বিনোদনের ক্ষেত্রে বৈপ্লবিক পরিবর্তন সৃষ্টিত হয়েছে। অবাধ তথ্য প্রবাহের কারণে সাংস্কৃতিক বিনিময় ও বিনোদনের নব নব মাত্রা সংস্কৃতি মানব জীবনকে আরোশি করে তুলেছে। সেই সাথে যুগোপযোগী শিল্প সংস্কৃতি সম্পর্কে অবহিত হয়ে তদনুযায়ী দেশীয় সংস্কৃতির মূলধারার পাশাপাশি এর মানোন্নয়নও ঘটানো সম্ভব হচ্ছে।

### ১.৫.২ তথ্য প্রযুক্তির নেতিবাচক প্রভাব

**আসক্তি :** তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির নিয়ন্ত্রণহীন অবাধ ব্যবহারের ফলে পারিবারিক, সামাজিক এমনকি রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে নেতিবাচক অবস্থা পরিলক্ষিত হচ্ছে। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম (বেসন— ফেসবুক, টুইটার, ইনস্টাগ্রাম ইত্যাদি) ব্যবহারের তীব্র আসক্তির কতিকারক প্রভাব আশঙ্কাজনক মাত্রায় বেড়ে যাচ্ছে। এর ফলে অল্পবয়সি শিক্ষার্থীরা পড়াশুনার অনন্যোযোগী, নৈতিক-অনৈতিকতার তফাত শনাক্ত করতে না পারা, শুল্লাচারে অনীহাসহ নানা অসামাজিকতার লিপ্ততা তাদের পেয়ে কসছে। অতিভাবকলণও এর আসক্তি থেকে নিকৃতি পাচ্ছেন না; যার দরুন কর্মক্ষেত্রে প্রমথটা নষ্ট, অনৈতিক কার্যকলাপে অর্থহীনভাবে সময়ক্ষেপণ, স্বাভাবিক পারিবারিক নিয়মাজারে ব্যত্যয়, সন্তানদের সময় না দেয়া বা তাদের প্রতি যত্নবান না হওয়ার অনেক অনতিশ্রুত ঘটনার জন্ম হচ্ছে। অনলাইনে গেমসের আসক্তি আরো ভয়াবহ প্রভাব ফেলেছে সামাজিক জীবনে। ঘটনার পর ঘটনা এতে কালক্ষেপণ মাদকাসক্তির মতো উন্নয়নের নেশাপ্রভাবের নিমজ্জিত হয়ে যাচ্ছে সমাজের একটি বিরাট অংশ। এসব গেমসের জন্য নিজেদের সম্মান বিক্রির মতো চরম অনৈতিক ঘটনাও সংঘটনের খবর পাওয়া গেছে। অনলাইন গেমসে আসক্ত হয়ে ব্যবহারকারীদের মৃত্যুসুখে গতিত হওয়ার মতো ঘটনাও বিভিন্ন দেশে ঘটেছে। অনেক রাশিয়ান নাগরিকের সূই গেমসের মাধ্যমে অনেক ছেলেমেয়ে আত্মহত্যা বা অকাল মৃত্যুর খবর আমরা সবাই অবগত আছি। এছাড়া বিদেশি সংস্কৃতির বিরূপ প্রভাব জো রয়েছেই। আজকালকার প্রতিটি দেশের চলচ্চিত্রে প্রদর্শিত মারামারি, খুনখুনি ও অন্যান্য ভারোলেস অনুকরণ করে

উঠতি বয়সি ছেলেমেয়েদেরকে সহিংস করে তুলছে। এসবের ফলে আচার-আচরণ, মানসিকতা, পোশাক-পরিচ্ছদে নেতিবাচক পরিবর্তন লক্ষণীয় মাত্রায় বাড়তে দেখা যাচ্ছে। অবাধ তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির অপব্যবহারে কুরুচিপূর্ণ ছবি বা ভিডিও এখন স্বল্পমূল্যের মোবাইল ফোনেও দৃশ্যমান।

**অপরাধ :** সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে তীব্র আসক্তির কারণে কোমলমতি শিশু-কিশোরসহ সমাজের এক বৃহৎংশ বিপথগামী হওয়ার আশঙ্কা থেকেই যাচ্ছে। মতলববাজ হ্যাকাররা নানা কৌশলে বিভিন্ন ব্যবসা প্রতিষ্ঠানসহ ব্যক্তিগত গোপনীয় তথ্য চুরি/পাচার, সাইবার হামলা, নেতিবাচক প্রোপাগান্ডা ছড়িয়ে দিয়ে সমাজে অস্থিতিশীল পরিবেশের জন্ম দিতে পারে।

**স্বাস্থ্যগত সমস্যা :** তথ্য ও যোগাযোগ সংক্রান্ত যন্ত্রপাতি বিশেষত কম্পিউটারের অত্যধিক ব্যবহারের ফলে চোখের উপর চাপ পড়ে, মাথা ব্যথা, হাত ব্যথা, ঘাড় ও পিঠের সমস্যায় আক্রান্ত হতে দেখা যায় অনেককেই। রাত জেগে মোবাইল ফোন ব্যবহার, কম্পিউটার বা ইন্টারনেটে সময় কাটানোর কারণে স্নায়বিক ও মস্তিষ্কের নানাবিধ অসুস্থতাও পরিলক্ষিত হচ্ছে।

পরিশেষে বলা যায়, চিকিৎসার জন্য ব্যবহৃত সার্জারির চাকুর ব্যবহার যথাযথভাবে না করে খুন-খারাবির কাজের অপব্যবহার রোধ করার দায়িত্ব সার্জারি-চাকুর নয়, এই দায়িত্ব আমাদের সবার। একইভাবে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির যথোপযুক্ত ব্যবহার নিশ্চিতের মাধ্যমে মানব সভ্যতাকে আরো অনন্যমাত্রায় অধিষ্ঠিত করার জন্য প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখতেই হবে।

## ১.৬ তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি এবং অর্থনৈতিক উন্নয়ন (ICT & Economical Development)

অর্থনৈতিক উন্নয়ন বলতে একটি দেশের জীবনযাত্রার মানোন্নয়নকেই বোঝায়। উন্নত জীবনযাত্রা মানে উন্নত শিক্ষাব্যবস্থা, সাধারণ মানুষের আয়ের স্তর বৃদ্ধি, স্বাস্থ্যকর পরিবেশ নিশ্চিত হওয়া, নিরাপদ জীবন ব্যবস্থা থাকা এবং সবার উপর নাগরিকদের মৌলিক চাহিদাগুলো অনায়াসে পূরণ হওয়াকে বোঝায়। তথ্য প্রযুক্তির অভূতপূর্ব উন্নতিতে নাগরিক জীবনের প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে উন্নয়নের ছোঁয়ায় মানুষের জীবন আরো বেগবান, সহজ, নিরাপদ এবং স্বাচ্ছন্দ্যময় হয়েছে। সেইসাথে অবাধ তথ্য প্রবাহের জন্য পুরো পৃথিবীকেই একটি গ্লোবাল ভিলেজে পরিণত করে দিয়েছে।

আজকের বিশ্বে কম্পিউটার, সাবমেরিন কেবল এবং স্যাটেলাইট প্রযুক্তিকে কাজে লাগিয়ে সকল উন্নত এবং উন্নয়নশীল দেশগুলোই নিজেদের মতো করে তথ্য প্রবাহের মহাসড়কে প্রবেশ করে চলেছে। এর সূত্র ধরে অর্থনীতিবিদগণ বিশ্লেষণ করে দেখেছেন যে, উন্নত দেশগুলোর তুলনায় উন্নয়নশীল দেশগুলোর উৎপাদন খরচ অনেক কম হওয়ায়, উন্নয়নশীল দেশগুলোতে আইসিটির উন্নয়নের মাধ্যমে তাদের উল্লেখযোগ্য মাত্রায় অর্থনৈতিক উন্নয়ন সম্ভব।

### তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ভূমিকা

বিশ্বের উন্নত দেশগুলোর দিকে তাকালে দেখা যায়, এদের সমৃদ্ধির পিছনে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিগত উন্নয়ন অনেক বড় ভূমিকা পালন করেছে। এই খাতে প্রচুর বিনিয়োগে বেড়েছে মূলধন এবং প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে উৎপাদনশীলতা বেড়েছে বহুগুণে। ইউরোপীয় এবং উন্নত দেশগুলোয় জিডিপি- (GDP: Gross Domestic Product) বৃদ্ধির কারণ হিসেবে অর্থনীতির গবেষকগণ টেলিকমিউনিকেশন খাতের উন্নয়নকে চিহ্নিত করে থাকলেও সিংগাপুর, কোরিয়ার মতো দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির কারণ হিসেবে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির উন্নয়নকেই চিহ্নিত করেছেন।

**উন্নয়ন প্রক্রিয়া :** গবেষণায় প্রমাণিত হয়েছে যে, উন্নয়নশীল দেশগুলোয় অর্থনৈতিক উন্নয়ন সংঘটনে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি নিচে উল্লিখিত প্রক্রিয়ায় কাজ করে থাকে :

ফর্মা-৫, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি, একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণি



- শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও বেকারত্ব দূরীকরণের ক্ষেত্রে সমঅধিকার নিশ্চিতকরণ।
- সহজ পদ্ধতিতে তথ্য প্রাপ্তির ব্যবস্থাকরণ ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীকে যোগাযোগের ক্ষেত্রে সক্ষমতা সৃষ্টি।
- মানসম্মত কিন্তু তুলনামূলকভাবে কম দামের আইসিটি দ্রব্যের সহজলভ্যতা।
- দেশের সর্বস্তরে ই-গভর্নেন্সের (ইলেকট্রনিক গভর্নেন্স) চালুর মাধ্যমে সরকারি আমলাতন্ত্র হ্রাস।
- প্রতিটি ব্যবসা প্রতিষ্ঠানকে বৃহৎ বাজার-সুবিধা প্রদান এবং স্টেকহোল্ডারদের মধ্যে যোগাযোগ এবং সহযোগিতার মনোভাব তৈরি।

**জ্ঞানভিত্তিক অর্থনীতি :** আইসিটির উন্নয়নের ধারাকে অব্যাহত রাখতে জন্ম নিচ্ছে নতুনতর অর্থনীতি, যার নাম জ্ঞানভিত্তিক অর্থনীতি বা নলেজ ইকোনমি। জ্ঞানভিত্তিক অর্থনীতি বিকাশের সাথে সাথে আমেরিকা, ইউরোপ কিংবা বিশ্বের উন্নত দেশগুলোতে প্রয়োজন দেখা দিচ্ছে বিপুল পরিমাণ ডেটা প্রসেসিং বা প্রক্রিয়াকরণের। যার ফলে উন্নয়নশীল দেশসমূহ আইসিটি এনাবল্ড সার্ভিসগুলোকে কাজে লাগিয়ে অর্জন করছে বিপুল পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা। শুধু বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন নয়, এর ফলে বিপুল সংখ্যক প্রশিক্ষিত বেকার জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হচ্ছে।

### বাংলাদেশ প্রেক্ষিতে

বাংলাদেশের অর্থনীতি পৃথিবীর দ্রুততম বর্ধনশীল অর্থনীতি। বিশ্বের প্রতিষ্ঠিত অন্যান্য দেশের তুলনায় World Economic Forum-এর উন্নয়ন সূচকে আমরা ৩৪ তম অবস্থানে রয়েছি এবং ২০৩০ সালের মধ্যে এই অবস্থান ২৪ তম হবে মর্মে দৃঢ় আশাবাদ ব্যক্ত করা হয়েছে। বাংলাদেশকে উন্নয়নের সূচকে পৃথিবীর ‘পরবর্তী এগারোটি’ দেশের একটি দেশ বিবেচনা করা হয়।

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি দুইভাবে অর্থনীতির উন্নয়নে অবদান রাখতে পারে। প্রথমটি হলো সরাসরি সফটওয়্যার ইন্ডাস্ট্রির নানা ধরনের কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে। আর দ্বিতীয়টি হলো তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির উন্নতির ফলে সৃষ্ট বিভিন্ন সেবার মাধ্যমে। এদেশের ক্রমবর্ধমান অর্থনৈতিক উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে দেশীয় মোট উৎপাদনের ৮% ভাগ প্রবৃদ্ধি আইসিটি খাতের অবদান বলে অনুমান করা হয়। অক্সফোর্ড ইন্টারনেট ইনস্টিটিউট-এর মতে বিশ্বের মধ্যে অনলাইন কর্মীর সংখ্যার দিক দিয়ে বাংলাদেশের অবস্থান দ্বিতীয় বলে চিহ্নিত করা হয়েছে।

**সফটওয়্যার ইন্ডাস্ট্রি :** ২০১৯ সালের পরিসংখ্যান অনুযায়ী বাংলাদেশে ৮০০ (আটশত) রেজিস্টার্ড সফটওয়্যার কোম্পানি রয়েছে, অনুমান করা হয় এর পাশাপাশি অনিবেদিত আরো অনেক সফটওয়্যার কোম্পানি দেশে কাজ করছে। সফটওয়্যার কোম্পানিগুলোতে ৩০ হাজার থেকে বেশি পেশাজীবী কাজ করছেন এবং এর মোট রাজস্বের পরিমাণ ২৫০ মিলিয়ন ডলার। ২০১৬-১৭ সালে এই খাতে বাংলাদেশের আয় ছিল ৮০০ (আটশত) মিলিয়ন ডলার এবং ২০২১ সালের ভেতর এটিকে এক বিলিয়ন ডলারে উন্নীত করার পরিকল্পনা রয়েছে।

**ডিজিটাল বাংলাদেশ উদ্যোগ :** ডিজিটাল বাংলাদেশ বলতে দেশের প্রতিটি ক্ষেত্রে যথোপযুক্ত প্রযুক্তির ব্যবহার নিশ্চিতকরণকে বোঝায়, যার মূল দায়িত্বটি পালন করতে হয় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিকে। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহারের ফলে বাংলাদেশে ব্যাংকিং খাতে আমূল পরিবর্তন হয়েছে। দেশে বিদেশে টাকা পাঠানো অনেক সহজ হয়েছে। ইন্টারনেট দিয়ে নানা ধরনের বিল প্রদান করা যায়, এমনকি আয়কর পরিশোধ করা যায়। ২০২০ সালে করোনা ভাইরাসের সংক্রমণের সময় দেশে টেলিমেডিসিন ব্যাপকভাবে ব্যবহার করা শুরু হয়েছিল।

আমাদের দেশে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির সেবা জনগণের দোড়গোড়ায় পৌঁছে দেয়ার জন্য একসেস টু ইনফরমেশন (a2i) প্রকল্পের আওতায় প্রতিটি জেলা ও উপজেলায় তথ্য অফিসের মাধ্যমে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে যোগাযোগ স্থাপনের কাজ চালু হয়েছে। এতে করে তৃণমূল পর্যায়ের প্রশাসনিক ও স্থানীয় সরকার ব্যবস্থাপনাকে শক্তিশালী করার পাশাপাশি সরকারি সবধরনের পরিষেবার তথ্য প্রাপ্তি নিশ্চিত করা সম্ভব হয়েছে। প্রতিটি ইউনিয়ন পরিষদ অফিস, সাব-পোস্ট অফিসে তথ্য ও সেবা কেন্দ্র চালু করে সরকারি সবধরনের ডিজিটাল সার্ভিস সেবা প্রদান অব্যাহত রয়েছে।

**কৃষি সেবা :** বাংলাদেশের অর্থনীতির সবচেয়ে বড় অংশটি কৃষি খাত থেকে আসে কাজেই কৃষি ব্যবস্থায় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ব্যবহার অর্থনীতির উন্নয়নে একটা বড় ভূমিকা রাখতে পারে। গণমাধ্যমে নানা ধরনের অনুষ্ঠানের মাধ্যমে কৃষকদের ফসল, কৃষিপদ্ধতি, বাজারজাতকরণ সম্পর্কে নানা ধরনের তথ্য দেওয়া হয়। দেশের সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগে কৃষকদের নানা ধরনের প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার জন্য ওয়েবসাইট এবং অ্যাপ গড়ে তোলা হয়েছে। বাংলাদেশ এই ধরনের উদ্যোগে সুফল পেতে শুরু করেছে এবং সাম্প্রতিক সময়ে কৃষিপণ্যের উৎপাদন বহুগুণে বেড়ে গেছে।

**শিল্প ও উৎপাদন :** বাংলাদেশের প্রধান শিল্প গার্মেন্টস যেখানে ২০১৮ সালে ৩৬.৬৭ বিলিয়ন ডলার রপ্তানি বাণিজ্য হয়েছে। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ব্যবহার করে সমগ্র বিশ্বে নতুন বাজার ধরা, রপ্তানিযোগ্য পণ্য নির্বাচন কিংবা প্রয়োজনে ক্রেতা-বিক্রেতার মাঝে আলাপ-আলোচনা সবকিছুই আজকাল তথ্য প্রযুক্তির মাধ্যমে সম্পাদন হয়। গার্মেন্টস ছাড়াও রপ্তানি বাণিজ্যে জাহাজ নির্মাণ, মৎস্য, পাট, চামড়া শিল্প এবং ওষুধ শিল্পে বাংলাদেশ বড় ভূমিকা রেখেছে এবং এ সবগুলোর বিকাশেই তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির বড় ভূমিকা রাখা সম্ভব।

**দেশে ও বিদেশে কর্মসংস্থান :** এক সময়ে আশঙ্কা করা হতো তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির বিস্তারের কারণে অনেকের চাকুরি চলে গিয়ে বেকারত্ব বাড়বে। বাস্তবে এর সম্পূর্ণ বিপরীত ঘটনা ঘটেছে এবং যার ফলস্বরূপ লক্ষ লক্ষ বেকার যুবক-যুবতীর কর্মসংস্থান হয়েছে। সে কারণে আইসিটি প্রফেশনালদের চাহিদা দেশে-বিদেশে বেড়েই চলছে। অতীতের এক পরিসংখ্যানে দেখা গেছে যে, বিশ্বে প্রায় তিন মিলিয়ন আইটি পেশাজীবীর প্রয়োজন ছিল। বর্তমানে এ সংখ্যা দ্বিগুণেরও বেশি দাঁড়িয়েছে। যদি বিশ্ব চাহিদার প্রেক্ষিতে আমাদের দেশের প্রায় ৫০ হাজার আইটি প্রফেশনাল সরবরাহ করতে পারি তবে বর্তমান রেমিটেন্স বহুগুণে বাড়ানো সম্ভব। আমাদের দেশের প্রায় এক কোটি লোক বিদেশে শ্রমিক হিসেবে কাজ করে এবং তাদের পাঠানো রেমিটেন্স আমাদের জিডিপি-এর প্রায় ১০ শতাংশ পূরণ করে থাকে। যদি এই শ্রমিকদের তথ্য প্রযুক্তিতে ন্যূনতম প্রশিক্ষণ দিয়ে পাঠানো সম্ভব হয় তাহলেও তারা শুধু যে উন্নততর জীবন যাপন করতে পারবে তাই নয়, আমাদের অর্থনীতিতেও অনেক বেশি অবদান রাখতে পারবে।

## অনুশীলনী

### বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. বিশ্বগ্রামের জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কোনটি?
 

ক. তথ্য	খ. সফটওয়্যার
গ. হার্ডওয়্যার	ঘ. কানেক্টিভিটি
২. DNA এর নতুন সিকুয়েন্স তৈরিতে কোনটি ব্যবহৃত হয়?
 

ক. জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং	খ. ন্যানো টেকনোলজি
গ. বায়োইনফরমেটিক্স	ঘ. বায়োমেট্রিক্স
৩. ভার্সুয়াল রিয়েলিটিতে কত মাত্রার ইমেজ ব্যবহার করা হয়?
 

ক. একমাত্রিক	খ. দ্বি-মাত্রিক
গ. ত্রি-মাত্রিক	ঘ. বহুমাত্রিক
৪. রোবট কোন কাজে ব্যবহার করা হয়?
 

ক. প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে	খ. মানুষের বিকল্প হিসাবে বিপদজনক কাজে
গ. মানুষের কর্মক্ষেত্র বৃদ্ধি করতে	ঘ. স্বাধীনভাবে জটিল গ্রহণ করতে
৫. টেলি প্রেজেন্স এর প্রয়োগ ক্ষেত্র কোনটি?
 

ক. ক্রায়োসার্জারি	খ. বায়োমেট্রিক্স
গ. আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স	ঘ. ভার্সুয়াল রিয়েলিটি
৬. বায়োমেট্রিক্স পদ্ধতি ব্যবহৃত হয়-
  - i. বাড়ির নিরাপত্তায়
  - ii. শিক্ষার্থীদের উপস্থিতি নির্ণয় করতে
  - iii. অপরাধ প্রবণতা শনাক্তকরণে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii	খ. i ও iii
গ. ii ও iii	ঘ. i, ii ও iii

নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং ৭ ও ৮ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও :

চার বন্ধু চারটি ভিন্ন ভিন্ন কোম্পানিতে কর্মকর্তা হিসেবে কর্মরত। এদের অফিসের প্রবেশ পথে কাউকে হাতের আঙুল, কাউকে সম্পূর্ণ হাত একটি যন্ত্রের ওপর রেখে অফিসে ঢুকতে হয়। কাউকে একটি ক্যামেরার সামনে চোখ স্থির করে দাঁড়াতে হয় কিংবা সম্পূর্ণ মুখমণ্ডলই ক্যামেরার সামনে কয়েক মুহূর্ত রাখতে হয়। এদের প্রত্যেকের দাবি, অফিসের উপস্থিতি ও নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে স্ব-স্ব অফিসে ব্যবহৃত পদ্ধতি অধিক কার্যকর।



- i. দেশীয় প্রজাতির বিলুপ্তি হতে পারে  
ii. ফলন কমে যেতে পারে  
iii. নতুন রোগ সৃষ্টি হতে পারে  
নিচের কোনটি সঠিক?  
ক. i ও ii  
খ. i ও iii  
গ. ii ও iii  
ঘ. i, ii ও iii

### সৃজনশীল প্রশ্ন

১. বিপু ও জয়নাল দুই জনই উচ্চ-মাধ্যমিক স্তরে পড়াশোনা করে। তাদের আইসিটি শিক্ষক - “বিশ্বের পরিচ্ছন্ন শহরের ট্রাফিক ব্যবস্থায় ব্যবহৃত প্রযুক্তি ঢাকায় ব্যবহার” বিষয়ে অ্যাসাইনমেন্ট তৈরি করতে দিলেন। বিপু কলেজ লাইব্রেরি এবং অন্যান্য লাইব্রেরিতে বসে বই পড়ে এবং ইন্টারনেট থেকে তথ্য সংগ্রহ করে অ্যাসাইনমেন্ট তৈরি করল। অ্যাসাইনমেন্টে সে সকল তথ্যসূত্র উল্লেখ করল। জয়নাল বিশ্ববিদ্যালয়ের এক সিনিয়র ভাইয়ের অ্যাসাইনমেন্ট ইন্টারনেট থেকে নিয়ে কিছুটা পরিবর্তন করে জমা দিল। জয়নালের অ্যাসাইনমেন্ট দেখে আইসিটি শিক্ষকের বুঝতে অসুবিধা হলো না এটি কপি করা।

ক. ভার্সিয়াল রিয়েলিটি কী?

খ. ‘কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার মাধ্যমে মৌলিক গবেষণা সম্ভব নয়’- ব্যাখ্যা কর।

গ. বিপু তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির কোন অবদান ব্যবহার করেছে তা ব্যাখ্যা কর।

ঘ. প্রযুক্তির ব্যবহার বিবেচনায় বিপু এবং জয়নালের কাজের বৈসাদৃশ্য মূল্যায়ন কর।

২. মুমতাহ তার বাসায় আনা নতুন টিভিতে একটি সিনেমা দেখল। সিনেমা দেখার ক্ষেত্রে একটি বিশেষ ধরনের চশমা ব্যবহার করলে নিজেই সিনেমার অংশ মনে হয়। সে খুবই আনন্দিত হলো। সে তার বাবাকে জিজ্ঞেস করে জানতে পারল একটি বিশেষ প্রযুক্তি ব্যবহার করে টিভি এবং সিনেমাটি তৈরি করা হয়েছে। মুমতাহ তার এই আনন্দ অনুভূতি তার Facebook account এর মাধ্যমে বন্ধুদের সাথে শেয়ার করল।

ক. রোবটিক্স কি?

খ. ডিজিটাল বাংলাদেশ এর ধারণাটি ব্যাখ্যা কর।

গ. উদ্ভীপকে ব্যবহৃত প্রযুক্তিটি ব্যাখ্যা কর।

ঘ. বন্ধুদের সাথে মুমতাহার আনন্দ-অনুভূতি শেয়ার বিশ্বগ্রাম ধারণা সংশ্লিষ্ট- এর যৌক্তিকতা ব্যাখ্যা কর।

৩. ড. সাইফুল্লাহ তাঁর ল্যাবরেটরি কক্ষে আঙ্গুলের চাপ দিয়ে প্রবেশ করেন। একই ল্যাবরেটরির অন্য কক্ষে প্রবেশ করার সময় সেপারের দিকে তাকানোর ফলে দরজা খুলে গেল। একদিন তিনি বন্ধু চিকিৎসকের নিকট গালের ঝাঁচিল অপারেশনের জন্য গেলেন। বন্ধু তাঁকে স্বপ্ন সময়ে - ২০°C তাপমাত্রায় রক্তপাতহীন অপারেশন করলেন। কিছুক্ষণ পর তিনি তার ল্যাবরেটরিতে ফিরে এসে কাজ শুরু করলেন।

ক. ভিডিও কনফারেন্সিং কী?

খ. ঘরে বসে ডাক্তারের চিকিৎসা গ্রহণ করার পদ্ধতিটি ব্যাখ্যা কর।

গ. ড. সাইফুল্লাহর চিকিৎসায় চিকিৎসক কোন পদ্ধতি ব্যবহার করেছিলেন? ব্যাখ্যা কর।

ঘ. উদ্ভীপকে উল্লিখিত প্রযুক্তিগুলো মূলত একই - মতামত দাও।

৪. গবেষক শিহাব শাহরিয়ার সকালে তাঁর ল্যাবে প্রবেশ করতে গিয়ে দরজা খুলতে পারছেন না। কারণ গতকাল তিনি তার হাতের একটি আঙ্গুল কেটে যাওয়ায় ব্যান্ডেজ করে রেখেছেন। ফলে তাঁকে বন্ধু শাফায়াত না আসা পর্যন্ত বাইরে অপেক্ষা করতে হলো। এতে বিরক্ত হয়ে তিনি ল্যাবের দরজা খোলার জন্য পাসওয়ার্ডযুক্ত প্রযুক্তি ব্যবহারের জন্য কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ করলেন।

ক. রোবট কী?

খ. বাংলাদেশ খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ হয়েছে তথ্য প্রযুক্তির কল্যাণে- ব্যাখ্যা কর।

গ. ল্যাবে কোন প্রযুক্তির ব্যবহার করে শিহাব শাহরিয়ার দরজা খুলে থাকেন? - ব্যাখ্যা কর।

ঘ. শিহাব শাহরিয়ার কর্তৃপক্ষকে যে প্রস্তাব দিলেন, তা কি যৌক্তিক? বিশ্লেষণ কর।